মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৭, সংখ্যা-০৫

جون ২০১৮ ইং, রমাজান-শাওয়াল ১৪৩৯ হি., জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বাং

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

رمضان و شوال ١٤٣٩هـ، يونيو ٢٠١٨م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
‘ফাজায়েলে আমাল’ নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪২....... ৪
দরসে ফিক্বহ :
সদকার প্রকার ও ব্যয়ের খাতসমূহ ৬
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদুয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৪
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
আসাতিযায়ে কেরামের প্রতি মূল্যবান নসীহত........ ১৫
“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ :
ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের দলিল.................... ১৮
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব
ঈদ : উৎসব ও ইবাদত................................. ২৪
মাওলানা শরীফ উসমানি
যৌতুক প্রথা : মানবতাবিবর্জিত একটি সামাজিক অভিশাপ........ ২৭
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৫....... ২৯
মুফতী শরীফুল আজম
ভিন্ন চোখে কওমী মাদরাসা-১৭......................... ৩৫
মাওলানা কাসেম শরীফ
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৮
যে কাজে পুণ্য নষ্ট হয়.................................. ৪৪
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ১ শাওয়াল ঈদের দিন। এদিন কোনো রোযা নেই বরং এদিন আল্লাহর নির্দেশেই সকলকে সাড়া দিতে হয় আনন্দ-উৎসবে।

এদিন তিনি পুরস্কৃত করবেন তাদের, যারা সিয়াম সাধনা করেছে, রাতে ইবাদত করেছে, আল্লাহকে স্মরণ করেছে, তার হুকুম পালন করেছে। হাদীস শরীফে এসেছে–

فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، يَعْنِى يَوْمَ فِطْرِهِمْ، بَاهَى بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ، فَقَالَ :يَا مَلَائِكَتِى مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفَّى عَمَلَهُ؟، قَالُوا :رَبَّنَا جَزَاؤُهُ أَنْ يُوفَى أَجْرَهُ، قَالَ :مَلَائِكَتِى عَبِيدِى وَإِمَائِى قَضَوْا فَرِيضَتِى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوا يَعِجُّونَ إِلَىَّ بِالدُّعَاءِ، وَعِزَّتِى وَجَلَالِى وَكَرَمِى وَعُلُوِّى وَارْتِفَاعِ مَكَانِى لَأُجِيبَنَّهُمْ، فَيَقُولُ :ارْجِعُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، قَالَ :فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, 'যখন তাদের (রোযাদার বান্দাদের) ঈদের দিন হয়, অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন, তখন আল্লাহ তা'আলা রোযাদার বান্দাদের সম্পর্কে ফেরেশতাগণের সঙ্গে গর্ব করে জিজ্ঞেস করেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! বলো দেখি, আমার কর্তব্যপরায়ণ প্রেমিক বান্দার বিনিময় কী হবে? ফেরেশতাগণ বলেন, হে প্রভু! পূর্ণরূপে তার পারিশ্রমিক দান করাই তো তার প্রতিদান। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা-বান্দিরা তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছে, অতঃপর আমার কাছে দু'আ করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে (ঈদগাহে) গমন করেছে, আমার সম্মান, মর্যাদা, দয়া, বড়ত্ব ও মহত্ত্বের কসম, জেনে রাখো আমি তাদের দু'আ কবুল করব। অতঃপর বলেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা এখন যেতে পারো, আমি তোমাদের পাপগুলোকে নেকির দ্বারা পরিবর্তন করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অতঃপর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। (শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] হা. ৩৪৪৪)

অন্য হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَوْسٍ الْأَنْصَارِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الطُّرُقِ، فَنَادَوْا :اغْدُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَبٍّ كَرِيمٍ يَمُنُّ بِالْخَيْرِ، ثُمَّ يُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، لَقَدْ أُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ، وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، نَادَى مُنَادٍ :أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ، فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِى السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ

রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো ইরশাদ করেছেন, ঈদুল ফিতরের দিন ফেরেশতাগণ ঈদগাহের পথে বিভিন্ন অংশে দাঁড়িয়ে উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করতে থাকেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা আপন করুণাময় মহান পরোয়ারদিগারের দরবারে উপস্থিত হও। তিনি আপন দয়া ও মেহেরবানিতে নেক আমল ও ইবাদতের তাওফিক দান করেন। অতঃপর এর বিনিময়ে বিরাট পুরস্কারে ভূষিত করেন। তোমাদেরকে ইবাদত-বন্দেগির জন্য হুকুম করা হয়েছে; তোমরা তা পূরণ করেছ। তোমাদেরকে রোযার হুকুম করা হয়েছে; তোমরা তাও পূরণ করেছ–এভাবে তোমরা তাঁর আনুগত্য করেছ। অতএব, এখন তোমরা তোমাদের প্রাপ্য বিনিময় ও পুরস্কার নিয়ে যাও। অতঃপর ঈদের নামায শেষ হওয়ার পর ফেরেশতাগণ ঘোষণা করেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোমরা নিশ্চিন্তমনে সফলকাম ও কৃতকার্য অবস্থায় বাড়িতে ফিরে যাও। এভাবেই এ দিনটির নাম হয়েছে 'পুরস্কারের দিন'। ঊর্ধ্ব জগতেও এই দিনটিকে একই নামে অভিহিত করা হয়। (মুজামুল কাবীর [তাবারানী] হা. ৬১৭, তরগিব তারহিব : ২/৩৮৮)

আসন্ন ঈদ দিবসে মহান রাব্বুল আলামীন গোটা উম্মাহকে ক্ষমা করুন। মাসিক 'আল-আবরার'-এর পাঠক, গ্রাহক, এজেন্ট, লেখক সকলকে কবুল করুন, সকলের ওপর রহমত বর্ষণ করুন ও সামগ্রিকভাবে সুখী জীবন দান করুন–এই প্রত্যাশায়।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা
২৯/০৫/২০১৮ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

বলে দিন, পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব হে বুদ্ধিমানগণ! আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো। (সূরা মায়েদা ১০০)

আরবী ভাষায় طيب ও خبيث বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে طيب এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে خبيث বলা হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, আয়াতে خبيث শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং طيب দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতেও পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল-হারাম সমান হতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে خبيث ও طيب শব্দ দুটি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ-সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভালো ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কোনো সুস্থ-বিবেকবানের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ এবং ভালো ও মন্দ সমান নয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার কাছে হালাল ও হারাম কিংবা পবিত্র ও অপবত্রি বস্তু সমান নয়। এমনিভাবে ভালো ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্র এবং সৎ ও অসৎ লোকও সমান নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ অর্থাৎ যদিও মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদেরকে বিস্মিত করে দেয় এবং আশপাশে মন্দ ও অপবত্রি বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভালো বলে মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটিবিশেষ।

এই আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে কোনো কোনো রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি মদের কারবার করত এবং এ পথে বেশ অর্থ-সম্পদও উপার্জন করেছিল। ইসলামে মদ্যপান ও মদের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে গেলে সে লোক মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদের কারবার দ্বারা সঞ্চিত যেসব টাকা-পয়সা আমার কাছে রয়েছে, সেগুলো কোনো সৎকাজে ব্যয় করে দিলে আমার জন্য উপকার হবে কি? মহানবী (সা.) বললেন, যদি তুমি এসব টাকা-পয়সা হজ, জিহাদ ইত্যাদি কাজেও ব্যয় করো, তবুও তা আল্লাহর কাছে মাছির ডানার সমানও মূল্যবান হবে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না।

এ হচ্ছে পরকালের দিক দিয়ে হারাম মালের অমর্যাদা। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এবং প্রত্যেক কাজের শেষ পরিণতিকে সামনে রাখলে বোঝা যায় যে জগতের কাজকারবারেও হারাম ও হালাল মাল সমান নয়। হালাল মাল দ্বারা যতটুকু উপকার, সুফল এবং সত্যিকার সুখ-শান্তি লাভ করা যায়, হারাম মাল দ্বারা তা কখনো লাভ করা যায় না।

তাফসীরে দুররে মনসূরে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, তাবেয়ীদের যামানায় খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ পূর্ববর্তী খলীফাদের আরোপিত অবৈধ কর রহিত করে দেন এবং যাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থকড়ি আদায় করা হয়েছিল, তা সবই ফেরত দেন। ফলে সরকারি ধনাগার শূন্য হয়ে যায় এবং আমদানি সীমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখে জনৈক প্রাদেশিক গভর্নর খলীফার কাছে পত্র লিখলেন যে সরকারি আমদানি অনেক হ্রাস পেয়েছে। এখন সরকারি কাজকারবার কিভাবে চলবে, তা-ই চিন্তার বিষয়। খলীফা হযরত উমর ইবনে ইব্দুল আজীজ (রহ.) উত্তরে আলোচ্য আয়াতটি لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ লিখলেন। অতঃপর লিখলেন, তোমার পূর্ববর্তী গভর্নররা অন্যায় ও অত্যাচারের মাধ্যমে ধনাগার যতটুকু পূর্ণ করেছিল, তুমি এর বিপরীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় ধনাগারকে ততটুকু হ্রাস করে নাও এবং কোনো পরোয়া করো না। আমাদের সরকারি কাজকর্ম টাকা-পয়সা দিয়েই পূর্ণ হবে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও এর ব্যাপক অর্থ এই যে সংখ্যার কমবেশি কোনো বিষয় নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যাল্পতা দ্বারা কোনো বস্তুর ভালো-মন্দ যাচাই করা যায় না। মাথার ওপর হাত গণনা করে ৫১ হাতকে ৪৯ হাতের বিপক্ষে সত্য ও সত্যবাদিতার মাপকাঠি বলা যায় না।

বরং জগতের সকল স্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে ভালো বিষয়ের পরিমাণ ও সংখ্যা কম এবং মন্দ বিষয়ের সংখ্যা অধিক। ঈমানের বিপরীতে কুফর, আল্লাহভীতি, পবিত্র ও ধার্মিকতার বিপরীতে পাপাচার ও অন্যায়াচরণ; ও ন্যায় ও সুবিচারের প্রাচুর্য বিদ্যমান। এতে এরূপ বিশ্বাসই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, কোনো বস্তু কিংবা কোনো দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সে বস্তু বা দলের ভালো ও সত্যপন্থী হওয়ার প্রমাণ কিছুতেই হতে পারে না। বরং কোনো বস্তুর উৎকৃষ্টতা ব্যক্তিগত অবস্থা ও হাল-হাকীকতের ওপরই তা নির্ভরশীল। অবস্থা হাল-হাকীকত ভার হলে বস্তুটি ভালো, নতুবা মন্দ। পবিত্র কোরআন এই সত্যটিই وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ বাক্যে ফুটিয়ে তুলেছে।

অবশ্য ইসলামও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যকে চূড়ান্ত মীমাংসা সাব্যস্ত করেছে। তবে তা ওই সব ক্ষেত্রেই যেখানে যুক্তির সারবত্তা ও ব্যক্তিগত গুণাগুণ যাচাই করার মতো কোনো ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা বিদ্যমান নেই। এ ক্ষেত্রে জনগণের বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্য সংখ্যাধিক্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। উদাহরণত গভর্নর নিযুক্তির প্রশ্নে যদি কোনো নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী শাসনকর্তার অভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে জনগণের মতানৈক্য পরিহারের লক্ষ্যে সংখ্যাধিক্যকেই অগ্রগণ্য মনে করা হয়। এর অর্থ কখনোই এমন নয় যে অধিকসংখ্যক লোক যে কাজ করবে তা-ই হালাল, বৈধ ও সত্য হবে।

(তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন অবলম্বনে)

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪২

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে নামায–দ্বিতীয় অধ্যায় :

জামা'আতের বর্ণনা

হাদীস নং-৭।

نا إبراهيم بن محمد، نا يحيى بن الحارث، ثنا أبو غسان المدنى، عن أبى حازم، عن سهل بن سعد قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِى الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হযরত সাহাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যারা অন্ধকারে বেশি বেশি মসজিদে গমন করে, তাদের কিয়ামত দিবসের পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান করো।

(সহীহে ইবনে খুজাইমা ২/৩৭৭ হা. ১৪৯৮-১৪৯৯, মুসতাদরাকে হাকিম ১/২১২ হা. ৭৬৮, সুনানে ইবনে মাযাহ ১/৪৩০ হা. ৭৮০)

হাদীসটির মান : সহীহ

حَدَّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبد الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِىُّ، قَال :حَدَّثنا يَحْيَى بن كثير، قَال :حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ أُوْسٍ عَنْ بُرَيدة، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِى الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(সুনানে আবু দাউদ ১/৩৮৯ হা. ৫৬৯, সুনানে তিরমিযী ১/৪৩৫ হা. ২২৩, আস সুনানুল কুবরা ৩/৬৪ হা. ৪৯৭৭, আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৬৬ হা. ৪৭২)

হাদীসটির মান : হাসান

حَدَّثنا مَجْزَأَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ، مَوْلَى ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ قَالَ: حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الصَّائِغُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِى الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(মুসতাদরাকে হাকেম ১/২১২ হা. ৭৬৯, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৪৩০ হা. ৭৮১, সুনানে বায়হাকী ৩/৬৪ হা. ৪৯৭৬)

হাদীসটির মান : সহীহ লিগাইরিহী।

ক. এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তারা কিয়ামতের দিন নিশ্চিন্তমনে নূরের মিম্বারে অবস্থান করবে এবং অন্যান্যরা ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে থাকবে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ الْحِمْصِىُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَلَمَةَ الْقَيْسِىِّ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :بَشِّرِ الْمُدْلِجِينَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِى الظُّلَمِ بِمَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَفْزَعُ النَّاسُ وَلَا يَفْزَعُونَ

(আল মুজামুল কাবীর ৮/১৬৭-১৬৮ হা. ৭৬৩৩-৭৬৩৪, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ২/১২৩ হা. ১০৩৩)

হাদীসটির মান : সহীহ লিগাইরিহী।

খ. এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? ফেরেশতারা আরজ করবে, আপনার প্রতিবেশী কারা? ইরশাদ হবে, যারা মসজিদ আবাদ করত।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى السَّرِىِّ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى السَّمْحِ، عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :أَيْنَ جِيرَانِى؟ فَتَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ :وَمَنْ يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ جَارَكَ؟ فَيَقُولُ :عُمَّارُ مَسْجِدِى

وَعَنْ أَنَسٍ -رضى الله عنه -قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم " :-إِنَّ اللهَ -عز وجل -لَيُنَادِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ جِيرَانِى؟ ,أَيْنَ جِيرَانِى؟ ,فَتَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ :رَبَّنَا وَمَنْ يَنْبَغِى أَنْ يُجَاوِرَكَ؟، فَيَقُولُ :أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ؟

(হিলইয়াতুল আওলিয়া ১০২১৩ হা. ৫৪৭, আল জামেউস সহীহ লিস সুনান ওয়াল মাসানীদ ৭/৬১, মুসনাদুল হারেস [যাওয়ায়েদ হায়সামী] ১/২৫১, ১২৬ হা. ২৭২৮)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

গ. এক হাদীসে এসেছে, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় স্থান হলো মসজিদ আর সর্বাধিক অপ্রিয় স্থান হলো বাজার।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالاَ :حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى ذُبَابٍ، فِى رِوَايَةِ هَارُونَ، وَفِى حَدِيثِ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِى الْحَارِثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، مَوْلَى أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا

(মুসলিম শরীফ ১/৪৬৪ হা. ৬৭১, সহীহে ইবনে খুজাইমা ২/২৬৯ হা. ১২৯৩, সুনানে বায়হাকী ৩/৬৫ হা. ৪৯৮৩)
হাদীসটির মান : সহীহ

ঘ. এক হাদীসে এসেছে, মসজিদসমূহ জান্নাতের বাগান।

عن ابى هريرة قال: رياض الجنة المساجد

(আল জামিউস সাগীর ২/৯২৯ হা. ৪৪৮৫)

ঙ. একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণনা করেন, তোমরা যাকে মসজিদে যেতে অভ্যস্থ দেখ তার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দাও। অতঃপর এই আয়াত তিলাওয়াত করেন–

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়াম দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তারাই মসজিদসমূহকে আবাদ করে।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالإِيمَانِ "، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ :(إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)

(সহীহে ইবনে খুজাইমা ২/৩৭৯ হা. ১৫০২, সহীহে ইবনে হিব্বান ৫/৬ হা. ১৭৯১, মুসতাদরাকে হাকিম ১/২১৩ হা. ৭৭০, তিরমিযী শরীফ ৫/১৪ হা. ৩৬১৭, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৪৩৯ হা. ৮০৬, মুসনাদে আহমদ ৩/৬৮ হা. ১১৬৫৭)
হাদীসটির মান : হাসান

চ. এক হাদীসে আছে, কষ্টের সময় ওজু করা, মসজিদের দিকে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকা গোনাহসমূহ ধৌত করে দেয়।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، تَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلاً

(মুসতাদরাকে হাকিম ১/১৩২ হা. ৪৫৬, মুসনাদে আবু ইয়ালা ১/২৫৮ হা. ৪৮৪, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৩/১৫ হা. ২৭৩৯)
হাদীসটির মান : সহীহ

ছ. আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তির রাস্তা মসজিদ হতে যত দূরে হবে, তার সওয়াব তত বেশি হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا

(আবু দাউদ শরীফ ১/৩৭৭ হা. ৫৫৬, ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৪৩১ হা. ৭৮১)
হাদীসটির মান : সহীহ

জ. এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনটি কাজের সওয়াব যদি মানুষের জানা থাকত, তবে যুদ্ধ করে হলেও তা লাভ করত। এক. আযান দেওয়া। ২. দুপুরের সময় জামাতে নামায পড়ার জন্য যাওয়া। ৩. প্রথম কাতারে নামায পড়া।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

(বোখারী শরীফ ১/১২৬ হা. ৬১৫, মুসলিম শরীফ ১/৩২৫ হা. [৪৩৭] ১২৯)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

সদকার প্রকার ও ব্যয়ের খাতসমূহ

মুফতী শাহেদ রহমানী

সদকার আভিধানিক অর্থ :

مايعطى على وجه التقرب الى الله تعالى لاوجه المكرمة

অর্থ : যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য দান করা হয়, সম্মান লাভের জন্য নয়। (আল মুজামুল ওয়াসীত, পৃ. ৫৩০)

পারিভাষিক অর্থ :

يقول الراغب الاصفهانى الصدقة مايخرجه الانسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة فى الاصل تقال: للمتطوع به والزكاة تقال للواجب۔

ভাষাবিদ রাগিব ইসফাহানীর মতে, সদকা বলা হয়, মানুষ যা নিজ সম্পদ হতে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য দান করে। যেমন–যাকাত। তবে মৌলিকভাবে সদকা শব্দটি সাধারণ দানের ক্ষেত্রে এবং যাকাত শব্দটি ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। (আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা ২৬/৩২৩)

সদকার প্রকারসমূহ

১. ফরয :

(ক) শরয়ী কর্তৃক মালের ওপর আরোপিত সদকা তথা যাকাত। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে যাকাতের ক্ষেত্রে সদকা শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– خذ من اموالهم صدقه অথবা انما الصدقات ।

(খ) শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন ফিদইয়া ও কাফফারা।

২. ওয়াজিব :

(ক) শরীয়ত কর্তৃক জানের ওপর আরোপিত সদকা তথা সদকাহে ফিতর বা ফিতরা।

(খ) বান্দা নিজে নিজের ওপর বাধ্যতামূলক ধার্যকৃত সদকা তথা মান্নতের কারণে ওয়াজিব সদকা।

৩. নফল :

সকল প্রকার ঐচ্ছিক দান-খয়রাত, যা মানুষ স্বেচ্ছায় প্রদান করে থাকে। নফল সদকা হিসেবে বিবেচ্য।

৪. অন্যান্য :

সকল প্রকার সৎকর্ম মানুষের আমলনামায় একটি সদকা হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন–বৃক্ষরোপণ, কূপ খনন, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, মুসাফিরখানা নির্মাণ, জনসেবামূলক কাজ, সদাচরণ, কোনো মুসলমানের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা, বোঝা বহনকারীর কাঁধে বোঝা তুলে দেওয়াতে সহযোগিতা করা, কূপ থেকে নিজের জন্য উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করা ইত্যাদি। এসংক্রান্ত কিছু হাদীস তুলে ধরা হলো।

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَبَسُّمُكَ فِى وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِى أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِىءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِى دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার হাসি তোমার জন্য সদকাস্বরূপ। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজের নিষেধ করাও সদকা। পথ হারানো ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়াও সদকা। দৃষ্টিহীনকে পথ দেখানো সদকা। রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা, হাড় বিদূরিত করাও তোমার জন্য সদকা। তোমার বালতি থেকে তোমার (দ্বীনি) ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেওয়া তোমার জন্য সদকাস্বরূপ। (তিরমিযী শরীফ-১৯৫৬)

عَنْ أَبِى ذَرٍّ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ :يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِءُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ভোরে ওঠে, তখন তার প্রতিটি জোড়ার ওপর একটি সদকা থাকে। প্রতি সুবহানাল্লাহ সদকা, প্রতি আলহামদুলিল্লাহ সদকা, প্রতি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সদকা, প্রতিটি আল্লাহু আকবার সদকা, সৎ কাজের আদেশ সদকা, অসৎ কাজের নিষেধ সদকা। অবশ্য চাশতের সময় দুই রাক'আত নামায আদায় করা এসবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (মুসলিম শরীফ-১৬৭১)

عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ الدُّؤَلِىِّ، قَالَ :بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِى ذَرٍّ، قَالَ :يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ فِى كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ،

وِزْرٌ؟ وَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ

আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.)-এর সাহাবীদের কয়েকজন নবীজি (সা.)-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বিত্তবানরা সওয়াব নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা আমাদের মতো সালাত আদায় করেন, আমাদের মতো সিয়াম পালন করেন এবং তাঁরা নিজেদের অতিরিক্ত সম্পদ হতে কিছু দান করে থাকেন। তিনি বললেন, তোমাদের জন্য কি আল্লাহ তা'আলা সদকা করার ব্যবস্থা করেননি? প্রতিটি তাসবীহ সদকা, প্রতিটি তাকবীর সদকা, প্রতিটি তাহমীদ সদকা, প্রতিটি তাহলীল সদকা। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজ হতে বিরত রাখা সদকা এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিলনও সদকা। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ যদি জৈবিক চাহিদা পূরণ করে তাতেও কি সে সওয়াব পাবে? তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করো যদি সে কামাচার করে হারাম পথে তাতে কি তার পাপ হবে না? অনুরূপভাবে যদি সে কামাচার করে হালাল পথে তবে সে সওয়াব পাবে। (মুসলিম শরীফ-২৩২৯)

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তুমি নিজে যা আহার করবে তা তোমার পক্ষে সদকা হবে, তোমার সন্তানদের যা কিছু খাওয়াবে তা তোমার জন্য সদকা হবে, তোমার স্ত্রীকে যা খাওয়াবে তোমার জন্য তা সদকা হবে, খাদেমদেরকে যা কিছু খাওয়াবে তা তোমার জন্য সদকা হিসেবে থেকে যাবে। (মুসনাদে আহমদ-৪/১৩১)

বাতলিয়ে দেওয়া সদকা। (বোখারী শরীফ-২৮৯১)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বিদূরিত করা সদকাস্বরূপ। (বোখারী শরীফ)

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

ইবন নুমায়র (রহ.) জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যেকোনো মুসলমান (ফলবান) গাছ লাগাবে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হবে তা তার জন্য দান (সদকা)স্বরূপ, যা কিছু চুরি হবে তাও দানস্বরূপ, বন্য জন্তু যা খাবে, তাও দানস্বরূপ। পাখি যা খাবে, তাও দানস্বরূপ। আর কেউ যেকোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করলে তাও তার জন্য দানস্বরূপ। (মুসলিম শরীফ-৩৯৬৮)

عَنْ أَبِى ذَرٍّ، قَالَ :قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ .قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ، إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ "قَالَ: قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ " :أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى الْحَرَامِ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا

فَلَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدَقَةٌ، وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ، وَحَجٍّ صَدَقَةٌ، وَتَسْبِيحٍ صَدَقَةٌ، وَتَكْبِيرٍ صَدَقَةٌ، وَتَحْمِيدٍ صَدَقَةٌ، فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، ثُمَّ قَالَ :يُجْزِءُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى

আবুল আসওয়াদ আদ-দায়লামী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু যর (রা.)-এর দরবারে বসে থাকা অবস্থায় তিনি বলেন : তোমাদের প্রত্যেকের উচিত প্রত্যহ সকালে নিজেদের জন্য কিছু সদকা করা, তার প্রত্যেকটি নামাযই সদকাস্বরূপ, রোযাও সদকা, হজও সদকা, তাসবীহ পাঠও সদকা, তাকবীর পাঠও সদকা, তাহমীদ পাঠও সদকাস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (সা.) উপরোক্ত কাজগুলোকে পুণ্যের কাজসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। অতঃপর বলেছেন, কেউ চাশতের সময়ে দুই রাক'আত নামায আদায় করলে সে ওই ব্যক্তির ওইগুলোর অনুরূপ সওয়াব পাবে। (আবু দাউদ শরীফ-১২৮৬)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :كُلُّ سُلَامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ، يُعِينُ الرَّجُلَ فِى دَابَّتِهِ، يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) বলেছেন, শরীরের প্রতিটি জোড়ার ওপর প্রতিদিন একটি করে সদকা রয়েছে। কোনো লোককে তার সওয়ারীর ওপর ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করা অথবা তার মাল-সরঞ্জাম তুলে দেওয়া সদকা। উত্তম কথা বলা ও নামাযের উদ্দেশ্যে গমনের প্রতিটি পদক্ষেপ সদকা এবং (পথিককে) রাস্তা

عَنْ أَبِى ذَرٍّ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ الأَغْنِيَاءُ بِالأَجْرِ، يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ قَالَ" :وَأَنْتُمْ تُصَلُّونَ وَتَصُومُونَ وَتَحُجُّونَ "قُلْتُ :يَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ قَالَ" :وَأَنْتَ فِيكَ صَدَقَةٌ: رَفْعُكَ الْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وَعَوْنُكَ الضَّعِيفَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ صَدَقَةٌ، وَبَيَانُكَ عَنِ الأَرْثَمِ صَدَقَةٌ، وَمُبَاضَعَتُكَ امْرَأَتَكَ صَدَقَةٌ "قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ، نَأْتِى شَهْوَتَنَا وَنُؤْجَرُ؟ قَالَ" :أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلْتَهُ فِى حَرَامٍ، أَكُنْتَ تَأْثَمُ؟ "قَالَ :قُلْتُ: نَعَمْ .قَالَ" :فَتَحْتَسِبُونَ بِالشَّرِّ وَلَا تَحْتَسِبُونَ بِالْخَيْرِ

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) বলেন, আমি একবার রাসূল (সা.)-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধনীরা তো সব সওয়াবই নিয়ে গেল, তারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, আবার হজ করে। হুজুর (সা.) বললেন, তোমরাও তো নামায পড়ো, রোযা রাখো, হজ করো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা দান-সদকা করে অথচ আমরা তা করতে পারি না। হুজুর (সা.) বললেন, হে আবু যর! তোমার অনেক সদকা করার সুযোগ রয়েছে, রাস্তা থেকে হাড় সরানো একটি সদকা, পথ ভোলা ব্যক্তিকে রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া একটি সদকা, নিজ খাবারের উপার্জনের অতিরিক্ত অংশ দ্বারা অসহায়-দুর্বলদের সাহায্য করা একটি সদকা, বাক্‌প্রতিবন্ধীর ভাব প্রকাশে সহযোগিতা করা একটি সদকা, স্ত্রী সহবাসও একটি সদকা, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা নিজেদের কামভাব পুরা করলেও কি সওয়াব পাব? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, তুমি কি মনে করো যদি তুমি অবৈধভাবে কামভাব পুরা করতে তাহলে কি গোনাহ হতো না? আমি বললাম, অবশ্যই গোনাহ হতো। তিনি বললেন, তাহলে যে ক্ষেত্রে তোমরা গোনাহের আশঙ্কা করে থাকো সে ক্ষেত্রে সওয়াবের প্রত্যাশা কেন করতে পারো না। (মুসনাদে আহমদ-৫/১৫৪)

সদকার খাত :

(১) ফরয বা ওয়াজিব সদকা :

পবিত্র কোরআনে ফরয-ওয়াজিব সদকা তথা যাকাত, ফেতরা, ফিদয়া, কাফফারা ও মান্নতের মতো সদকার খাত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থ : যাকাত হলো কেবল ফকির-মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত প্রজ্ঞাময়। (সূরা আত্ তাওবাহ-৬০)

মুনাফিকরা আপবাদ রটাত যে রাসূলুল্লাহ (সা.) সদকা বণ্টনে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে চলেছেন। (নাউযু বিল্লাহ) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সদকার ব্যয় খাত ঠিক করে দিয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন এবং কারা সদকা পাওয়ার উপযুক্ত তা বাতলে দিয়েছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর হুকুম মতেই সদকার বিলি-বণ্টন করেছেন। নিজের খেয়াল-খুশিমতো নয়।

সাহাবা ও তাবেঈগণের ঐকমত্যে অত্র আয়াতে সেই ওয়াজিব সদকার খাতগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের জন্য নামাযের মতোই ফরয। কারণ এই আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরয সদকারই খাত। (তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন)

(২) নফল সদকা :

মূলত নফল সদকা হচ্ছে হাদিয়া বা হেবাদানের মতো একটি বিষয়। ধনী-গরিব সকলকেই এ ধরনের সদকা বা হাদিয়া প্রদান করা যায়। এ হিসেবে নফল সদকার খাত ফরয সদকা অপেক্ষা ব্যাপক।

واتفقوا على انها تحل للغنى لان صدقة التطوع كالهبة فتصح للغنى والفقير (الموسوعة الفقهية ٢٦/٣٣٢، المبسوط ١٢/٩٢)

واما الصدقة التطوع فيجوز صرفها الى الغنى لانها تجرى مجرى الهبة (بدائع الصنائع ٦/٧٠)

বিশেষ খাত তালেবে ইলম :

কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের দায়িত্বে যারা নিজেকে সঁপে দেয় তারাই প্রকৃত তালেবে ইলম। এরা পার্থিব সকল ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে জীবিকা উপার্জনের পথ ত্যাগ করে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য নিজেকে আবদ্ধ করে রাখে। এ ধরনের তালেবে ইলম সদকার বিশেষ খাত হিসেবে বিবেচিত। যদি সে গরিব হয় তবে ফরয, ওয়াজিব বা নফল সকল প্রকার সদকার উপযুক্ত হবে। আর গরিব না হলে নফল সদকা বা হাদিয়ার উত্তম পাত্র হিসেবে গণ্য হবে। ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকার দরুন যারা আয়-রোজগারের কোনো পন্থা অবলম্বন করার সুযোগ পায় না, পবিত্র কোরআনে তাদেরকে সদকার বিশেষ খাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

সদকা (বিশেষ করে) ওই সকল গরিব

লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে তা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। (সূরা আল বাকারা-২৭৩)

উক্ত আয়াতে স্বতন্ত্রভাবে দ্বীনি ইলম শেখা-শেখানোর কাজে নিয়োজিত যারা তাদেরকে সদকা করার কথা বলা হয়েছে। অন্য কোনো খাতের আলোচনা এখানে করা হয়নি। এই একটিমাত্র খাতের আলোচনা ভিন্নভাবে করার কারণে গুরুত্ব বেড়ে যায়। তাই সাধারণ খাতে সদকা করার চেয়ে বিশেষ এই খাতে সদকা করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

وفيه دلالة على كون هؤلاء الفقراء المحصرين فى سبيل الله احق بالصدقات من غيرهم لان الله تعالى لم يذكرهنا من مصارفها غيرهم (احكام القرآن للتهانوى ١/٦٠٩)

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সীরিনের মতামত

قال ابن كثير: يعنى المهاجرين الذين قد انقطعوا الى الله والى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على انفسهم ما يغنيهم۔

হাফেজ ইবনে কাসির (রহ.) احصروا فى سبيل الله "আল্লাহর পথে আবদ্ধ কারা"-এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, অর্থাৎ ওই সমস্ত মুহাজির, যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে নিমগ্ন হয়েছেন এবং ঘরবাড়ি ছেড়ে মদীনায় অবস্থান করেছেন তবে তাঁদের প্রয়োজন পূরণের এমন কোনো মাধ্যম ছিল না, যা তাঁদেরকে (অন্যদের সহযোগিতা থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দেয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৭০৪)

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী (রহ.) বলেন,

هؤلاء قوم كانوا مشتغلين بذكر الله وطاعته وعبوديته وكانت شدة استغراقهم فى تلك الطاعة احصرتهم عن الاشتغال سائر المهمات۔

এরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতেই উৎসর্গিত ছিল যার দরুণ তারা অন্য সকল ব্যস্ততা ও প্রয়োজন পূরণ থেকে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (তাফসীরে কাবীর ৪/৮২)

قال التهانوى: يعنى فقراء المهاجرين الذين حصروا انفسهم للجهاد فى سبيل الله ولتعلم ما انزل الله الى رسوله من الاحكام۔

এবং হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ ওই সকল গরিব মুহাজীরগণ, যাঁরা নিজেদের আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন এবং নবীজির ওপর অবতীর্ণ জীবন বিধান শিক্ষা করার জন্য নিয়োজিত হয়েছেন। (আহকামুল কোরআন ২/৬৫৮)

جواز نقل الصدقات من بلد الى غيره لطلبة العلوم الدينية۔

তিনি এ আয়াত থেকে একটি মাসআলাও উদ্ভাবন করেন যে তালেবে ইলমদের জন্য দান-খায়রাত এক শহর থেকে অন্য শহরে পাঠানো বা স্থানান্তর করা যাবে। (আহকামুল কোরআন ২/৬৫৭)

للفقراء الخ اصل حق ان حاجتمندوں کا ہے جو مقید ہوگئے ہوں اللہ کی راہ یعنی دین کی خدمت میں اور اسی خدمت دین میں مقید اور مشغول رہنے سے وہ لوگ طلب معاش کے لیے کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادت امکان نہیں رکھتے اور ناواقف ان کو تونگر خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے اور جاننا چاہئے کہ ہمارے ملک میں اس آیت کا مصداق سب سے زیادہ وہ حضرت ہیں جو علوم دینیہ کی اشاعت میں مشغول ہیں پس اس بنا پر سب سے اچھا مصرف طالب علم ٹھری۔ (بیان القرآن ۱/۱۸۸)

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশে এ আয়াতের সর্বোত্তম 'প্রয়োগক্ষেত্র' ওই সকল হযরাত, যারা ইলমে দ্বীন প্রচার-প্রসারে লিপ্ত।

قال العلامة شبیر احمد العثمانی: اب بھی جو کوئی قرآن کو حفظ کرے یا علم دین میں مشغول ہو تو لوگوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں۔

এ ছাড়া আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, এখনো যারা কোরআন হেফজ করবে কিংবা ইলমে দ্বীনের মাঝে মশগুল হবে, অন্য লোকদের জন্য তাদের সহযোগিতা করা অপরিহার্য। (তাফসীরে উসমানী ৫৮)। সুতরাং এরই ভিত্তিতে দান-খয়রাত প্রদানের সবচেয়ে বেশি উপযোগী স্থান তালেবে ইলমরা।

উপার্জনের সাথে ইলম অর্জন অসম্ভব :

উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইলম অর্জন আর অর্থ উপার্জন একসাথে চলতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ ব্যাপারে অক্ষম ঘোষণা করেছেন, অথচ তারা রুগ্ণ, পঙ্গু বা প্রতিবন্ধী নয়। অতএব তাদের এই উপার্জন অক্ষমতা শুধুমাত্র এই জন্য যে ইলম অর্জনের সাথে জীবিকা উপার্জন এক সাথে হতে পারে না। কারণ কথিত আছে ইলম তার সামান্য অংশও তোমাকে দান করবে না, যদি না তুমি তার জন্য নিজের সব কিছু বিসর্জন দাও। এর দ্বারা ওই সকল আধুনিকমনা লোকদের সমুচিত জবাব হয়ে গেছে, যারা তালেবে ইলমদের জন্য বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়ে

থাকে। ইলম যদি ওই সকল পেশা আর কারিগরির সাথে জমা হতে পারত তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে এর নির্দেশ দিতেন এবং তাদের জন্য সদকার মাঝে কোনো অংশ রাখতেন না। আর তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ হয়ে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম থেকে বিরত রাখতেন না। বিষয়টি খুব ভেবে দেখা প্রয়োজন। (আহকামুল কোরআন থানভী-১/৬৫৮)

অজ্ঞ লোক কারা :

প্রকৃত আহলে ইলম সদা নিজের দরিদ্রতাকে লুকানোর চেষ্টা করে এবং সচ্ছলতার ভান করে থাকে। এটা তার আত্মম্ভরিতা বা অহংবোধ থেকে করে না বরং ইলমী গাইরত বা ইলমের মর্যাদা রক্ষার প্রেরণা তাকে এটা করতে বাধ্য করে। পরিভাষায় এটাকে বলা হয় استغناء তথা গরিব হওয়া সত্যেও তা প্রকাশ না করে ধনী হওয়ার ভান করা। তাই আলেম-উলামা বা তালেবে ইলমদের সাধারণত এমন অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। তাদের বেশ-ভূষা দেখে আর্থিক অসচ্ছলতা নিরূপণ করা মুশকিল। তবে পকৃতপক্ষে তারাই সদকা বা হাদিয়ার সর্বাধিক হকদার। বাহ্যিক অবস্থা দেখে যারা এমন আলেম বা তালেবে ইলমকে সদকার যথার্থ খাত নয় বলে মনে করে এবং استغناء কে غناء মনে করে কোরআনের ভাষায় তারা অজ্ঞ। ইরশাদ হচ্ছে,

يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف۔ تعرفهم بسيمهم لايسئلون الناس الحافا

অর্থ : যাঞ্চা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। (সূরা আল বাকারা-২৭৩)

বিজ্ঞ আলেম তৈরি ফরযে কেফায়া :

লোকসমাজে কোরআন-সুন্নাহে বিজ্ঞ একদল আলেম তৈরি হওয়া ফরযে কেফায়া। যারা মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান পৌঁছানোর মধ্যস্থতা করবে। দ্বীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে গবেষণারত থাকবে। যাতে লোকসমাজে সৃষ্ট যাবতীয় সমস্যার শরীয়তসম্মত সমাধান প্রদানে সক্ষম হয়। আর এভাবে ইলম চর্চায় নিমগ্ন হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় একদল লোক তাতে লিপ্ত হলে সকলের পক্ষ থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় সকলে গোনাহগার হবে। এটাকেই বলে ফরযে কেফায়া। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে। (সূরা আত্ তাওবাহ-১২২)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে আল্লামা জাসসাস (রহ.) বলেন,

وفى هذه الاٰية دلالة على وجوب طلب العلم وانه مع ذلك فرض على الكفاية لما تضمنت من الامر بنفر الطائفة من الفرقة للتفقه وامر الباقيين بالقعود لقوله (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) احكام القرآن للجصاص ٣/٢٠٦)

অর্থ : এই আয়াতে এ কথার প্রমাণ মেলে যে ইলমে দ্বীন অর্জন করা আবশ্যক, তবে তা সেটা ফরযে কেফায়া পর্যায়ের। কেননা এখানে প্রত্যেক বড় দলের একটি অংশের প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর বাকিদের বসে থাকতে বলা হয়েছে। (আহকামুল কোরআন-৩/২০৬)

অতএব বিজ্ঞ আলেম তৈরি করা গোটা জাতির ওপর ফরযে কেফায়া। এই ফরয আদায়ের জন্য কেউ নিজ সন্তানকে মাদরাসায় দিতে হবে আর কিছু লোক মাদরাসা চলানোর যাবতীয় উপকরণ জোগান দিতে হবে। যার যার সাধ্যানুযায়ী সকলে চেষ্টা করে একদল বিজ্ঞ আলেম তৈরির ফরয আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। যার কাছে মাল আছে মাল দেবে, অন্যথায় বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করবে। অন্তত পক্ষে দু'আ করার মাধ্যমে হলেও এই মহতী কাজে অংশ নেবে। যদি কেউ কোনো উদ্যোগ না নেয় এবং সমাজ বিজ্ঞ আলেমশূন্য হয়ে পড়ে তবে সকলকে গোনাহের ভাগীদার হতে হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

অর্থ: সৎকর্ম ও তাকওয়ার বিষয়ে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করো। (সূরা মায়েদা-২)

قال القرطبى: فواجب على العالم ان يعين الناس بعلمه فيعلمهم ويعينهم الغنى بماله۔

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, আলেমের জন্য আবশ্যক হলো তাঁর ইলমের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধন করা এবং ধনীদের কর্তব্য হলো আলেমগণকে ধন-দৌলত দিয়ে সহযোগিতা করা। (তাফসীরে কুরতুবী-খ : ৬/৩৩)

قال الجصاص : يقتضى ظاهره ايجاب التعاون على كل ماكان طاعة لله تعالى لان البر هو طاعة الله۔

ইমাম জাস্সাস (রহ.) বলেন, সৎকর্মই যেহেতু ইবাদত, তাই প্রত্যেক সৎকর্মের জন্য সহায়তা করা আবশ্যক। (আহকামুল কোরআন লিল্ জাস্সাস-২/৩৮১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অর্থ : এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করজ দেবে উত্তম করজ। অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন, আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (বাকারা ২৪৬)

আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন,

جاء هذا الكلام فى معرض الندب والتحضيض على انفاق المال فى ذات الله تعالى على الفقراء المحتاجين وفى سبيل الله بنصرة الدين۔

এ আয়াতের মাঝে নফল সদকার আলোচনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গরিব মুখাপেক্ষীকে এবং দ্বীনের সাহায্যের জন্য আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। (আহকামুল কোরআন [ইবনে আরবী] ১/৩০৬)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থ : যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য.....। (সূরা তাওবা ৬০)

অনুরূপ আল্লামা শামী (রহ.) 'শুরুমবুলালিয়ার'-এর উদ্ধৃতি নকল করেন যে, " فى سبيل الله " এর মধ্যে তালেবে ইলম অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক যুক্তিসংগত।

হাদীসে নববীর আলোকে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ " :إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ :إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, মানুষ মৃত্যুবরণ করা মাত্রই তিনটি আমল ব্যতীত সব ধারা বন্ধ হয়ে যায়, (১) সদকায়ে জারিয়াহ, (২) উপকারী ইলম, (৩) সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি যারা তাঁর জন্য দু'আ করে। (মুসলিম শরীফ ৩/১২৫৫ হা. ১৬৩১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইয়ের সহযোগিতায় লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বান্দার সহযোগিতা করতে থাকে।

(মুসলিম শরীফ হা. [২৬৯৯] ৩৮)

মিশকাতের ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

وفيه اشارة الى فضيلة عون الاخ على اموره والمكافاة عليها بجنسها من العناية الالٰهية سواء كان بقلبه او ببدنه او بهما لدفع المضار او جذب المسار اذا لكل عون۔

উপরোক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায়, মুসলমান ভাইকে ধর্মীয় কাজে সার্বিক সহযোগিতা করার "যাতে সে নিশ্চিন্তে স্থিরতার সাথে ইবাদত করতে পারে।" ফজীলত অনেক বেশি। (মিরকাতুল মাফাতীহ-১/৪১৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পরও তার আমলনামায় যেসব আমলের নেকী ও সওয়াব যুক্ত হতে থাকবে তা হলো (১) ইলম, যা শিক্ষাদান করেছে এবং প্রচার-প্রসার করেছে, (২) নেক সন্তান, যাকে রেখে এসেছে, (৩) কিতাব বা গ্রন্থ, যা তিনি কাউকে দান করেছে, (৪) মসজিদ, যা সে বানিয়েছে, (৫) গৃহ, যা সে ইবনে সাবিলের জন্য নির্মাণ করেছে। (ইবনে মাজাহ শরীফ, পৃ. ১৫৮ হা. ২৪২)

قوله: او بيتا لابن السبيل بناه ، ذهب بعض العلماء فى تفسير ابن السبيل الى دخول الطلبة العلم فيه لانهم ضيوف الله ورسوله قد اشتغلوا بطلب علم الدين من الاحكام والفرائض۔

কেউ কেউ اوبيتا لابن السبيل بناه এর ব্যাখ্যায় তালেবে ইলমদের কথাও বলেছেন, যেহেতু এরা আল্লাহ ও তার রাসূলের মেহমান এবং ইলমে দ্বীন অর্জনে সর্বদা নিয়োজিত। যেমন হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, তালেবে ইলমদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ করাও এতে অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এরা নবীজির মেহমান, শুধু এতে ক্ষান্ত নয় যে তারা চুপচাপ বসে থাকে বরং তারা কালাল্লাহ, কালার রাসূল নিয়ে নিমগ্ন থাকে। (আল ইলমু ওয়াল উলামা, পৃ. ৫৭-৫৮)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ

অন্য হাদীসে হযরত আনাস বিন মালেক (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত। নবীজি (সা.)-এর যামানায় দুই ভাই ছিল।

তাদের একজন ইলমে দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে নবীজি (সা.)-এর দরবারে আসা-যাওয়া করত, অন্যজন উপার্জন করত। উপার্জনকারী তার ভাই সম্পর্কে অভিযোগ করলে নবীজি তাকে বললেন, হয়তো আল্লাহ তার উছিলায় তোমাকে রিযিক প্রদান করবেন। (তিরমিযী শরীফ হা. ২৩৪৫)

قال القارى: قوله لعلك ترزق به بصيغة المجهول اى ارجوا او اخاف انك مرذوق ببركته لا انه مرزوق بحرفتك فلا تمتن عليه بصنعتك وفى الحديث دليل على جواز ان يترك الانسان شغل الدنيا وان يقبل على العلم والعمل والتجرد لزاد العقبى۔

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, এতে বোঝা যায়, মানুষ দুনিয়ার ব্যস্ততা ছেড়ে ইলম ও আমলের অভিমুখী হয়ে পরকালের পাথেয়র জন্য নিবেদিত হওয়া বৈধ। (মিরকাতুল মাফাতীহ ৯/৪৯৭)

আসহাবে সুফ্ফার তরে সদকা :

নবীজি (সা.)-এর যুগের তালেবে ইলম ছিলেন আসহাবে সুফ্ফাগণ। ইলমে নববীর সুদা আহরণে তাঁরা দুনিয়ার সকল ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে মসজিদে নববীতে সার্বক্ষণিক অবস্থান করতেন। নবীজি (সা.)-এর পবিত্র রওজা ঘেঁষে বর্তমানে উঁচু যে চবুতরা বানিয়ে রাখা হয়েছে এটা ছিল ইসলামের ইতিহাসে তালেবে ইলমদের সর্বপ্রথম ব্যাচ আসহাবে সুফ্ফার অবস্থানস্থল। জায়গাটি আগে ইলমপিপাসু সাহাবায়ে কেরামদের (রা.) ত্যাগ-তিতিক্ষার সাক্ষ্য হয়ে আছে। ক্ষুৎপিপাসা ছিল যাদের নিত্যসঙ্গী। আজ হাদীসের কিতাবে প্রতি পাতায় পাতায় যে আবু হুরায়রা (রা.)-এর নাম দেখতে পাওয়া যায় সুফ্ফায় থেকে ইলম অর্জন করতে গিয়ে তিনি দিনের পর দিন না খেয়ে কষ্ট করেছিলেন। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁর বারবার মূর্ছা যাওয়ার ঘটনা ইতিহাসে বিরল। সদকার মালই ছিল তাঁদের প্রয়োজন পূরণের প্রধান সম্বল। সাহাবায়ে কেরামদের (রা.) মাঝে যাঁরা তুলনামূলক সচ্ছল ছিলেন, বাগবাগিচার মালিক ছিলেন তাঁরাই মূলত এই তালেবে ইলমদের খোঁজখবর নিতেন ও সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। খেজুর বাগানের মালিকগণ খেজুরের কাঁদি ধরে ঝুলিয়ে রাখতেন আর সুফ্ফার তালেবে ইলমগণ যাঁর যাঁর পছন্দমতো কাঁচা-পাকা খেজুর ছিঁড়ে খেতেন। একবার কেহ নিম্নমানের খেজুর এনে রেখে দিলে তা তালেবে ইলমদের শানমতো না হওয়ায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আয়াত নাযিল করে সতর্ক করা হয়েছিল।

আসহাবে সুফ্ফার দিনকাল :

হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لاتيمموا الخبيث منه تنفقون অর্থাৎ "তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু দান করতে যেও না।" আয়াতটি আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা খেজুর বৃক্ষের মালিক ছিলাম। কমবেশি এক-দুই থোকা করে খেজুর এনে আমরা মসজিদে ঝুলিয়ে দিতাম। এদিকে সুফ্ফার সাহাবাগণ ছিল আহার্যশূন্য তাই তারা ক্ষুধার্ত হলে লাঠির আঘাতে কাঁচা-পাকা খেজুর ঝরিয়ে আহার সেরে নিত। তবে পূণ্য দানে অনাগ্রহী কিছু লোক এমন ছিল যে তারা নষ্ট, শুকনো থোকা নিয়ে ঝুলিয়ে দিত, তখন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন,

يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض۔ ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه۔

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের অর্জিত মালের উৎকৃষ্টাংশ ও ভূউদ্গত উদ্ভিদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো। নিম্নমানের বস্তু দান করতে যেও না। কারণ তোমরাও তো দৃষ্টি অবনত করা বৈ তাহা গ্রহণ করো না।" তাদের বলেছেন, যদি তোমাদের প্রদত্ত খেজুরের মতো খেজুর তোমাদেরকে হাদিয়াস্বরূপ দেওয়া হতো তাহলে তোমরা লজ্জা কিংবা দৃষ্টি অবনত করা বৈ তা গ্রহণ করতে না। বারা (রা.) বলেন, এর পর থেকে আমরা নিজেদের উৎকৃষ্টাংশই নিয়ে আসতাম।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অদ্বিতীয় প্রভু আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি ক্ষুধার তাড়নায় ভূপতিত হয়ে থাকতাম, পেটে পাথর বাঁধতাম। একদিন আমি সাহাবাদের (রা.) চলাচলের পথে বসে পড়ি, আবু বকর (রা.) আমার পাশ ঘেঁষে অতিক্রম করলেন। আমি আহার ব্যবস্থার প্রার্থনা উদ্দেশ্য রেখেই তাঁকে একটি আয়াত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি কিছু না করেই চলে গেলেন। (এভাবে উমর (রা.)ও অতিক্রম করলেন, কিন্তু তিনিও কিছু না করেই চলে গেলেন)। অতঃপর অতিক্রম করতে লাগলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। তিনি আমার চেহারায় উদ্ভাসিত ও অন্তর্নিহিত বার্তা আঁচ করতে পেরে মৃদু হাসির রেখা টেনে বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, লাব্বাইক (উপস্থিত) হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, এসো। এই বলে চলতে লাগলেন। আমি তাঁর পিছু চলতে থাকলাম। তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আমি প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে অনুমতি দেন। তিনি বাসগৃহে প্রবেশ করেই এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেয়ে বললেন, এই দুধ কোথাকার? ঘরের লোকেরা বললেন, প্রমুখ ব্যক্তি আপনাকে হাদিয়াস্বরূপ দিয়েছে। তিনি বললেন, আবু হুরায়রা! আমি বললাম–লাব্বাইক, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! তিনি বললেন, আসহাবে সুফ্ফার নিকট গিয়ে তাদের ডেকে আনো।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) স্বীয় বর্ণনায়

উল্লেখ করেন, বিষয়টিতে আমার অপছন্দ অনুভূত হয়। (আমি মনে মনে বলেই ফেললাম) এতটুকু দুধ দিয়ে আসহাবে সুফ্ফার কী হবে! তা ছাড়া এই দুধে আমারই অধিকার বেশি, একবার পান করতে পারলেও কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেতাম। যখন তারা এল রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে আমি তাদের মাঝে দুধ পরিবেশন করতে থাকি। হায়! এই দুধ মোটেও কি আমার ভাগ্যে জুটবে? যা হোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্যের বিকল্প তো নেই। আমি পেয়ালা নিয়ে প্রত্যেককে পান করাতে লেগে যাই। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে।

এবার আসে রাসূল (সা.)-এর পালা। তিনি পেয়ালাটা নিয়ে হাতে রাখলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসির রেখা টেনে বললেন, আবু হুরায়রা! বসো, পান করো। আমি বসে পান করতে লাগলাম। একপর্যায়ে (পরিতৃপ্ত হয়ে) বলে ফেললাম, আর না। আল্লাহর শপথ–আর পান করতে পারছি না, (উদরে জায়গা নেই)। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে তৃপ্ত করো। আমি তাঁকে পেয়ালা দিলাম। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করত বিসমিল্লাহ পড়ে বাকিটুকু পান করলেন।

উল্লিখিত হাদীস থেকে বোঝা গেল, আসহাবে সুফ্ফার উত্তরসূরি তালেবে ইলমদের জন্য সদকা গ্রহণ দোষণীয় নয়। এবং তাদের জন্য বিত্তশালীদের পক্ষ থেকে সদকা বা হাদিয়া প্রদানের মাঝে আপত্তির কিছু নেই। নববী যুগের এই আদর্শ অনুসরণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে বর্তমানের দ্বীনি মাদরাসাসমূহ।

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামদের এ বিষয়ে অভিমত :

وفى الفتاوى الهندية: التصدق على الفقير العالم افضل من الصدقة على الجاهل

'ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে' উদ্ধৃত হয়েছে, গরিব আলেম ব্যক্তিকে সদকা করা একজন মূর্খ ব্যক্তিকে সদকা করা থেকে অধিক উত্তম।

وفى الفتاوى القاسمية: مدرسہ فی نفسہ مصرف زکاۃ نہیں، بلکہ مصرف لغیرہ ہے یعنی جب مدرسہ میں غریب ومحتاج طلبہ زیر تعلیم ہوں اور انکی کفالت کا کوئی نظم نہ ہو تو ایسا مدرسہ صدقہ واجبہ زکاۃ حرم قربانی وغیرہ کا مصرف ہو جاتا ہے اور زکاۃ دہندہ کی زکاۃ بغیر تکمل ادا ہو جاتی ہے چنانچہ جو حضرات اس مسئلہ میں علماء کو غلط ٹھراتے ہیں ان کے لیے اس سے تائب ہونا ضرور ہے۔ (فتاوی قاسمیہ ۱۱/۳۴)

অনুরূপ 'ফতওয়ায়ে কাসেমীয়াতে' উদ্ধৃত হয়েছে, মাদরাসা স্বতন্ত্র দান-খয়রাতের খাত নয়, তবে ক্ষেত্রবিশেষ খাতও বটে। অর্থাৎ যখন তাতে গরিব মুখাপেক্ষী ছাত্ররা ইলমে দ্বীনে শিক্ষারত হয় এবং তাদের সঠিক তত্ত্বাবধান এবং খরচাদির কোনো ব্যবস্থা না থাকে। তাহলে এ ধরনের মাদরাসা যাকাত, কোরবানীর চামড়া ইত্যাদি প্রদানের খাত হিসেবে গণ্য হবে, এতে যাকাত প্রদানকারীদের যাকাত নির্দ্বিধায় আদায় হয়ে যাবে। এ বিষয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে উলামায়ে কেরামদের মিথ্যারোপ বা অপবাদে জড়ায় তাদের জন্য এটা থেকে তাওবা করা উচিত।

উপসংহার

সুতরাং এসব আলোচনা-উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হলো যে ক্ষেত্রবিশেষ কওমী মাদরাসা কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও যাকাত প্রদানের খাত হতে পারে। অধিকন্তু এতে দান-খয়রাত প্রদান অন্য জায়গার চেয়ে উত্তমও বটে। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় কাজে সহযোগিতা অধিক সওয়াবের দাবি রাখে।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে যারা উলামায়ে কেরামদের গালমন্দ করে এবং অপবাদে জড়ায় তারা জাতিকে উলামাবিদ্বেষী এবং কওমী মাদরাসা বিমুখ করার হীন চেষ্টায় লিপ্ত এবং সর্বসাধারণের জন্য উলামায়ে কেরামের নিকট মাসআলা-মাসায়েল জানার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন।

==========

একটি জরুরি ব্যাখ্যা

==========

মাসিক 'আল-আবরার'-এর মে-২০১৮ ইং সংখ্যায় 'রোযার ফাজায়েল ও মাসায়েল' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, 'রোযা অবস্থায় কানের ভেতর তেল, ড্রপ বা অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করা যাবে–এর দ্বারা রোযা ভাঙবে না'।

ব্যাখ্যাসাপেক্ষ মাসআলাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করায় সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিষয়টিকে আরেকটু স্পষ্ট করে উপস্থাপন করা হলো।

পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরামের ফতোয়া হলো, কানে ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। একই ধারাবাহিকতায় অধিকাংশ আকাবীরগণও এটির ওপর ফতোয়া প্রদান করেছেন।

কানে ড্রপ ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাওয়ার ফতোয়াটি এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয় যে, কানে তেল বা ওষুধ প্রয়োগ করলে তা গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের বক্তব্য হলো, কানে তেল, ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহার করলে তা গলা পর্যন্ত পৌঁছার কোনো সুযোগ নেই। তাই সমসাময়িক অনেক ফকীহ রোযা ভাঙবে না বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন। যদিও সতর্কতা হলো, পূর্ববর্তী ফকীহগণের ফতোয়ার ওপর আমল করা। (ইনআমুল বারী ৫/৫২২)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সম্মাননা : আল্লাহ তা'আলার হিকমত বড়ই আশ্চর্যজনক। এই দুনিয়ার বড়ত্ব আর দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্ত থেকে চিন্তা করো। এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যে তাঁর আসল ঘরের দিকে রওনা দেন তাঁর জন্য কত সম্মান আর মর্যাদা রেখেছেন। সর্বপ্রথম সম্মান হলো, সারা জীবন সেই ব্যক্তি যাদের খিদমত করেছেন আজ সকলে তাঁর খিদমতে ব্যস্ত। তিনি দুনিয়ায় যাদের হাত-মুখ ধোয়াতেন তাদের প্রতি নির্দেশ হলো, আজ এই লোক আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আসল বাড়িতে চলে যাচ্ছেন তাই তাঁর হাত-মুখ, পা–সব তোমরা ধৌত করো। তাঁকে ওজু করিয়ে দাও। গোসল দাও।

দ্বিতীয় সম্মাননা হলো, এই লোক যাদের বিভিন্ন খিদমতে লিপ্ত থাকতেন আজকে যেহেতু তিনি আসল বাড়িতে চলে যাচ্ছেন তাই তাঁকে সকলে হাতে উঠিয়ে সুন্দর করে শোয়ালেন, সকলে মিলে কাফন পরালেন। কাফনের ব্যাপারে নির্দেশ হলো, সবচেয়ে উত্তম রং তথা সাদা হওয়া এবং অতি মূল্যবানও না আবার অতি কম দামিও না হওয়া।

তৃতীয় সম্মাননা। দুনিয়াতে একজন রাষ্ট্রপরিচালক বা প্রধানমন্ত্রীর সম্মাননায় কত কিছু করা হয়। লাল গালিচা থাকে, তাঁদের বহনের জন্য এয়ারবাস, হেলিকপ্টার এবং উন্নতমানের গাড়ি থাকে। আগেকার যুগে উন্নতমানের ঘোড়া ইত্যাদি থাকত। কিন্তু সব কিছুর চেয়ে মর্যাদাশীল ও উত্তম হলো মানুষ। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। বড়লোকদের দুনিয়াতে যত সম্মানই দেওয়া হোক না কেন, মানুষ তাদের বহন করে না। কিন্তু মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে আসল বাড়ির যাত্রি হয় তখন সে আশরাফুল মাখলুকাতের কাঁধের ওপর সওয়ার হয়েই যাত্রা করতে থাকে। আরেকটি সম্মান হলো, তাকে ইমাম বানিয়ে চলো। তার আগে চলো না। আবার এই নির্দেশও আছে যে চলার মধ্যেও খেয়াল রাখতে হবে, যেন বেশি দৌড়ে না চলে আবার একেবারে গতিহীনও নয়। অর্থাৎ দ্রুত চলো, তবে প্রতি কদম পুরোপুরি উঠিয়েই চলো। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই যাত্রির দুই অবস্থার একটি হবে। এক. আমল ভালো হবে। দুই. আমল খারাপ হবে। যদি আমল ভালো হয়, তবে সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে দেরি করা উচিত নয়। বরং যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় সেখানকার নিয়ামতগুলো তাড়াতাড়িই পেতে আরম্ভ করবে। যদি এর আমল খারাপ হয় তবে তাকে আপনার কাঁদের ওপর বেশিক্ষণ রাখবেন কেন?

আরেকটি সম্মান হলো, তাকে কবরে রাখার সময় নির্দেশ হলো এমনিতেই নিক্ষেপ করে দিও না। বরং নিজেদের হাতে উঠিয়ে অত্যন্ত মার্জিত ও সুন্দরভাবে কবরে রাখো। এর জন্যও রয়েছে ইসলামের বিশেষ রীতি। দুনিয়া ছেড়ে আসল বাড়ির যাত্রিদের ব্যাপারে এরূপই আচার-ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে ইসলামী শরীয়ত। আমার বলার বিষয় হলো, দেখেন উক্ত ব্যক্তিকে সম্মান দেওয়ার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা।

এখন দেখার বিষয় হলো, আসল ঘরের যাত্রিকে যে সম্মান দেওয়া হলো, আমরা যারা সামনে যাব, আমাদের কী অবস্থা হবে? যাত্রাপথে তার এই সম্মান থেকে বোঝা যায় যে মানুষকে দুনিয়াতে এমন আমল করতে হবে, যাতে যে সম্মানের সহিত সে যাচ্ছে, সেখানে যাওয়ার পরও সেই সম্মানের সহিত থাকতে পারে। সেখানেও সে এরূপ শান্তি ও আরাম ভোগ করতে পারে। আর এর পদ্ধতি হলো, সুন্নাতে রাসূলের ওপর জীবন গড়া। প্রতিটি বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের ওপর আমল করা। ইনশাআল্লাহ এর বরকতে সেখানেও ইজ্জত ও সম্মান দেওয়া হবে।

কবরস্থানে বেশি সময় নষ্ট না করা : কবরস্থানে যাওয়া হলে সেখানে বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। বরং যথাসম্ভব ঈসালে সাওয়াব করুন। শরীয়তে ঈসালে সাওয়াবের জন্য কোনো দিন-ক্ষণ নির্ধারিত নয়। যখন চান, যেভাবে চান, দু'আ করা যায়। যখনই সময় হয় করা যায়। শরীয়তে এসবকে এভাবে সহজ করা হয়েছে। সাধারণত লোকেরা তৃতীয় দিনটিকে এই কাজের জন্য নির্ধারণ করেন থাকেন। শরীয়তে এসবের কোনো ভিত্তি নেই।

বোঝার বিষয় হলো, আমাদের বাচ্চারা যখন তৃতীয় স্তরে পরীক্ষায় পাস করে, তখন আমরা বলি প্রথম বা দ্বিতীয় স্তর পাওয়া উচিত ছিল। তাতে বোঝা যায়, তৃতীয় স্তরে পাস করাকে আমরা খুব নগণ্য মনে করি। তাহলে আমাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন ইন্তেকাল করলে তাকে তৃতীয় স্তরে কেন ফেলে দেওয়া হয়। তার জন্য প্রথম, দ্বিতীয় দিন ঈসালে সাওয়াব না করে তৃতীয় দিনকে কেন ধার্য করা হয়। শরীয়তে তো প্রথম আর দ্বিতীয় দিন ঈসালে সাওয়াব করতে নিষেধ করেনি। কিন্তু আমরা কেন তাকে এই সম্মান ও প্রাপ্তি থেকে মাহরুম করব? এসব ঠিক নয়। যখন যেভাবে ইচ্ছা আমরা মৃতদের জন্য ঈসালে সাওয়াব করতে থাকব। কোনো দিন এবং কোনো রীতিকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া ঠিক নয়।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

আসাতিযায়ে কেরামের প্রতি মূল্যবান নসীহত

একটি বিষয়ে আমরা অস্থির। আর তা হলো, দুনিয়াতে জরুরত পুরা হবে কিভাবে? দেমাগের এই পেরেশানি আমাদের বিভিন্ন দিকে ঘোরাচ্ছে। কিন্তু আপনি কোরআন শরীফের একটি আয়াতে বারবার চিন্তা করতে থাকুন।

نحن نرزقكم واياهم "তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থাও আমি করি এবং তাদের রিযিকের ব্যবস্থাও।" (আনআম ১৫১) অন্য আয়াতে نحن نرزقهم وايـاكم আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ওদের রিযিকের ব্যবস্থাও আমি করি, তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থাও।" (মেরাজ ৩১)

পরিবার পরিকল্পনা, জন্মনিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে না। উক্ত দুটি আয়াতের ওপর মোরাকাবা তথা ধ্যান করুন। শয়তান ধোঁকা দেবে। আল্লাহ তা'আলা রিযিক কেমনে দেবেন? তোমাকে রিযিক এমনিতেই দিয়ে দেবে? চেষ্টা করতে হবে না?

হ্যাঁ, চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। আসবাব এখতিয়ার করা সুন্নাত, এ জন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং ভাবতে হবে, আমি আলেম। আমার দায়িত্ব হলো দ্বীনের খিদমত করা। অতএব আমি কোনো একটা মাদরাসায় পড়াতে বসে যাব। মুহতামিম সাহেব আমাকে তো কিছু দেবেন। দেওয়ার পরিমাণ আগে ঠিক হয়ে গেলে তাকে আমরা বেতন বলি। আর আগে ধার্য না হলে তাকে আমরা হাদিয়া বলি। বেতনেরই প্রচলন হয়ে গেছে। একটা পন্থা অবলম্বন করলাম আর কী। তাতে তো কিছু না কিছু পাচ্ছি। কিন্তু অন্তরে আসে 'এ বেতন দিয়ে কী হয়?' এটি একটি ওয়াসওয়াসা। কে বলেছে এগুলো দিয়ে হবে না? আপনার নজর শুধু পরিমাণের ওপর সীমাবদ্ধ করলেন কেন? "আল্লাহ পাক রিযিক দেন"–এই কথাটির প্রতি নজর নেই কেন? আপনি তো এই হাদীস নিজেই পাঠদান করেন, "এক কেজির মতো আটার রুটি ও সামান্য রান্না করা গোশত হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের দস্ত মুবারকে বণ্টন করেছিলেন। পনেরো শত লোক খেয়ে আরো অবশিষ্ট থেকে গেল।" এখন বলুন "স্বল্প বেতনে কী হবে?" এজাতীয় ভাবনা অন্তরে আসা কি ঠিক হবে?

এ ক্ষেত্রেও শয়তান একটা কথা অন্তরে ঢালবে। তা হলো "ওটা তো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতের বরকতে হয়েছিল। আমার হাতে কি সেই বরকত হবে? কেন হবে না? আপনার হাত সুন্নাতী হাত হলে অবশ্যই হবে। আপনার হাতকে সুন্নাতী হাত বানিয়ে নিতে হবে। আপনার জবানকে সুন্নাতী জবানে রূপান্তরিত করতে হবে। আপনারা কেন বলেন, এই জিনিসের মধ্যে অমুক হুজুরের হাত লেগেছে, বড় পীর সাহেব হুজুরের হাত লেগেছে, অমুক বড় মাওলানা সাহেবের হাত লেগেছে? আল্লাহ তা'আলা কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন–

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين-(الأنبياء ٨٨)

কোথায় নবীর ঘটনা আর কোথায় আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারকে ওয়াদা দিচ্ছেন। এখন এ কথা অন্তরে আসা "নবীর জন্য বরকত হয়েছে, আমার জন্য কিভাবে হবে?" এসব কুমন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই নয়। নবীর সাথে আল্লাহ তা'আলা যেই আচরণ করেছেন নবীর সত্যিকারের অনুসারীদের সাথেও আল্লাহ পাক সেই আচরণ করবেন।

আসবাব এখতিয়ার করা সুন্নাত। ইয়াকীন করতে হবে রিযিক আল্লাহ পাক দেবেন। এ জন্য আমাদের মুরব্বিরা এই আয়াতের ওপর ইয়াকীন করে উপকার পেয়েছেন। তাই মুরব্বিদের ইতিহাস পড়ুন, তাঁদের জীবনী আলোচনা করুন এবং তালেবে ইলম-উলামাদের শোনান। কিন্তু এই কাজ কিভাবে করা হবে? নিজেই এর ওপর ইয়াকীন রাখতে পারিনি। মাদরাসায় শিক্ষকতা করে পয়সা নিচ্ছি, ওয়াজ করে পয়সা নিচ্ছি, ইমামতি করে পয়সা নিচ্ছি, জুমু'আর নামায পড়িয়ে পয়সা নিচ্ছি, তাবিজ-কবজ দিয়ে পয়সা নিচ্ছি।

পটিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতাকালীন আমাকে দুই ওয়াক্ত নামাযের ইমাম বানানো হয়েছিল। এর জন্য আমার নামে ৫০ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু আমি তা নিতাম না। হিসাবরক্ষক সাহেব একদিন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতী আজিজুল হক সাহেব (রহ.)-কে বলেই দিলেন হুজুর তো ইমামতির টাকা নেন না। মুফতী সাহেব হুজুর মনে করেছেন পঞ্চাশ টাকা পরিমাণে কম, হয়তো এ জন্য নিই না। স্বাভাবিকভাবেই মুহতামিম সাহেবদের খুশি হওয়ার কথা। হুজুর আমার ইসলাহের জন্য অথবা নসীহতস্বরূপ কিছু বলার জন্য

আমাকে ডাকেন। আমি যাওয়ার পর হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ইমামতি বাবদ ধার্য করা টাকা নাও না? আমি বললাম–না, নিই না। অথচ নামায ঠিকমতো পড়াচ্ছি। আবার জিজ্ঞেস করলেন, পরিমাণ কি কম হয়? বললাম, না। তাহলে তুমি নাও না কেন? বললাম, হুজুর! বাপ-দাদার সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছি, এখন শুধু ভিটাটা আছে। ওটা আমি বিক্রি করতে চাচ্ছি না। আমরা পাঠদান করে বেতন নিচ্ছি, ওয়াজ করে বেতন নিচ্ছি। এগুলো আমাদের জমিজমা। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়িয়ে ছিলেন ওই মেহরাবে আমি দাঁড়িয়ে বেতন নিচ্ছি। মেহরাবটা হলো ভিটা। ওখানে রহমত নাযিল হয়। ওখান থেকে পুরা উম্মত রহমত পায় ইমামের ওসীলায়। এ জন্য হুজুর আমি ইমামতির বেতন নেব না।

দারুল উলূম দেওবন্দের মসজিদে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমাম ছিলাম, জুমু'আর নামায অন্য বড় মসজিদে পড়া হতো। তখন আমাকে মাসিক ১০ টাকা বেতন দেওয়া হতো, যা আমি নিতাম জরুরতে। এখন তো মাদরাসা আমাকে বেতন দিচ্ছে জরুরত কিসের? আমার যদি কোনো ওজর থাকে ইমামতি করব না। আর ইমামতি করলে বেতন কেন নেব? এই কথাগুলো আমি তখন বলছিলাম যখন আমার যৌবনকাল ছিল। আমার বিবি-বাচ্চা ছিল এবং পয়সারও দরকার ছিল। বৃদ্ধকালের কথা নয়। মনে চায় এখানে যেসব নওজোয়ান উলামায়ে কেরাম এসেছেন, আপনারা আমার যৌবনকালের কথাগুলো শুনে আপনাদের দিলে জযবা পয়দা হোক। আল্লাহ পাক সবাইকে তৌফিক দান করুন। মনোযোগ সহকারে মাদরাসায় পড়ান, আল্লাহ পাকের বাণী প্রচার-প্রসার করার জন্য পড়ান। আর মাদরাসার পক্ষ থেকে যা দেওয়া হয় ওটা নিয়ে শুকরিয়া আদায় করুন।

হযরতওয়ালা হারদূয়ী (রহ.) জামিয়াতুল আবরারের ভিত রেখে চলে গেলেন। ইন্তেকালের এক সপ্তাহ আগে আমরা হারদূয়ী গিয়েছিলাম। ওখানে আমরা তিন দিন ছিলাম। এই তিন দিন শুধু জামিয়াতুল আবরার এর আলোচনা করেছিলেন। এর মধ্যে উস্তাদ নিযুক্তির ব্যাপারে একটি অসিয়ত ছিল–চারটি গুণবিশিষ্ট উস্তাদ রাখবেন। ১। সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াতকারী হওয়া। ২। সুন্নাতের অনুসরণকারী হওয়া। ৩। খিদমতের জযবাওয়ালা হওয়া ও ৪। শরয়ী পর্দার ওপর গুরুত্ব প্রদানকারী হওয়া।

এখন আপনারা, সবার জন্য তা বলা হচ্ছে। আলেমের ঘরে শরয়ী পর্দা থাকবে না, চোখকে হেফাজত করা হবে না, তাঁর বোখারী শরীফ পড়ানোর দ্বারা কী ফায়দা? যিনি ভাবি, মামি, চাচি, খালাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোনের সাথে শরয়ী পর্দা রক্ষা করেন না। এদের বোখারী-মুসলিম শরীফ পড়ানো, দ্বীনি কিতাব পড়ানো কিসের উপকারে আসবে? এরা বদদ্বীন। তালেবে ইলম তৈরি কিভাবে হবে?

হারদূয়ী হযরত বলেন, জামিয়াতুল আবরারে শরয়ী পর্দার ওপর গুরুত্ব প্রদানকারী উস্তাদ রাখবেন। আলহামদুলিল্লাহ! এখন তো আট বছর চলছে, যাঁরা দেখছেন তো জানেন, দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত মাদরাসা। সাড়ে ছয় শতের মতো তালেবে ইলম পড়ে। পঁচিশজনের মতো উস্তাদ, কর্মচারী এর বাইরে। তারা ইসলাহী জোড়ে আসতে চেয়েছিল। আমি বলেছি, পাঁচজন উস্তাদ আসবে। কুর'আ আন্দাজি তথা লটারির মাধ্যমেই নির্ধারণ করা হবে। হেফজখানা আর মুতাফাররিকা বিভাগে লেখাপড়া চলবে। তাই এ বিভাগদ্বয়ের শিক্ষকরা আসবে না। আর লটারি সুন্নাত পদ্ধতিতে হবে। সব উস্তাদের নাম লিখে একটি রুমাল বা কাপড়ের ভেতর রাখা হবে আর একজন নাবালেগ ছেলের মাধ্যমে কাগজ উঠানো হবে। লটারি দেওয়ার পর দেখা গেল বড়দের একজনের নামও ওঠেনি। দ্বিতীয় স্তরের পাঁচজনের নাম উঠেছে এবং তারাই এসেছে। আমি মনে মনে হাসলাম আর ভাবলাম। কুর'আ আন্দাজি লটারি আজিব জিনিস। মনে করলাম অমুক এলে ভালো হতো, কিন্তু কুর'আ তার বিপরীত হয়ে গেছে। আমরা করব কী? আল্লাহ পাকের কোনো হেকমত আছে। যারা পাক্কা ইরাদা করেছেন; কিন্তু আসতে পারেননি তাঁরা সওয়াব পাবেন।

আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম, সেখানে উস্তাদগণের বেতন নেই। প্রথম দিনই তাঁদের বলেছি, খিদমতের জযবা নিয়ে পড়ান, বেতন দেওয়া হবে না। বেতন নেই বলে কোনো উস্তাদ চলে যাননি। অন্য কারণে চলে গেছেন বা বিদায় দেওয়া হয়েছে। অথবা আমাদের অন্য কোনো মাদরাসায় বদলি করা হয়েছে। কিন্তু পরিবার চালাতে পারছেন না এ জন্য কোনো উস্তাদ এখান থেকে চলে যাননি। কারো দুই মাসের বেতন একসাথে বাকি আছে এ রকমও নয়। হয়তো মাসে দু-চার দিন এদিক-ওদিক হয়। তাঁদের চাইতে হয় না। লেফাফা ভরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় উস্তাদদের হাতে। কেবল একটা কথা বলেছি, আমল হয় কি না জানি না। টাকাগুলো গুনবেন না, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন না! খাম থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী বের করে খরচ করবেন! একটা নোট নেবেন, সেটা ভাঙিয়ে খরচ করবেন, বাকি টাকা কত আছে দেখবেন না! নজর করবেন না। কিন্তু শয়তান তো বসে থাকবে না? নিশ্চয়ই কুমন্ত্রণা দেবে–একটু গুনে দেখো।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন, খামিরার ওপর ঢাকনা দিয়ে রাখো, ঢাকনা ওঠাবে না। খানা রান্না করে ঢেকে রাখবে, খুলবে না, দেখবে না। তদ্রূপ লেফাফা ঢাকনা দিয়ে রাখতে চাচ্ছি। ওখান থেকে খরচ করুন, যত দিয়েছি দেখবেন না। আমল করলে বরকত হবে। আমল না করলে আমি কী করব? আলহামদুলিল্লাহ, অষ্টম বছর তো চলছে। আট বছর না, আট লাখ বছর চলবে ইনশাআল্লাহ! কথাগুলো মানতে হবে। শুধু শুনলে হবে না। শোনার পরে ইয়াকীন করুন আর ইয়াকীন করার পর মেনে চলুন।

মনে চায়, আমার সাথে সম্পর্কিত মুহতামিম সাহেবেগণ দু-একটা মাদরাসা এভাবে চালানোর জন্য হিম্মত করুন। সিদ্ধান্ত নিন–বেতন দেব না, হাদিয়া দেব।

বেতন ছাড়া এ পদ্ধতি কেন চালু করা হলো? আমার একটি নিয়্যাত ছিল। আমাদের উস্তাদরা প্রায়ই গরিব হন। বেতন ধার্য না করলে যাকাত থেকে দিতে পারব। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর সুযোগ হয়নি। কারণ সেখানে কালেকশন না থাকায় যাকাতের টাকা বেশি হচ্ছে না। কালেকশন থাকলে যাকাতের টাকা বেশি হয়। ৭ বছর পর্যন্ত যাকাত ফান্ডে কর্জ। যাকাতের টাকা বেশি হয়ে গেলে হিলা করতে হবে না, গরিব উস্তাদদের দিলে হয়ে যাবে। আর প্রায় উস্তাদ গরিব। কয়জন উস্তাদ বড়লোক আছেন আমার জানা নেই। তবে মাঝে মাঝে শুনি, জামীল মাদরাসার প্রায় উস্তাদ নাকি যাকাত দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখেন। সত্য-মিথ্যা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে যাচাই করিনি। এ রকম কোনো মাদরাসা থাকলে ভালো, আল্লাহপাক বরকত দান করুন।

আমার জানা মতে, অধিকাংশ মাদরাসার উস্তাদ গরিব। তাঁদের বেতন ঠিক না থাকলে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে। কমও দেওয়া যাবে। বেশিও দেওয়া যাবে। আল্লাহপাক আমাদের দোস্ত-আহবাবদের দ্বারা সেই রকম মাদরাসা চালু করে দিক। কিছু উস্তাদও বলবে, আমি বেতন নেব না। হাদিয়া হলে দিতে পারেন। আবার জযবায় এসে তাড়াহুড়া করে এটা করবেন না যে বেতনই নেব না। এটা একদম সহজ কিন্তু মুরব্বিরা নিষেধ করেন। ধীরে ধীরে ইয়াকীন পয়দা করুন। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) রচিত آپ بیتی (আপবীতী) পড়ুন। তাড়াতাড়ি করে বেতন ছাড়বেন না। শায়খুল হাদীস (রহ.) বেতন নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনিও বেতন নেওয়া ছেড়ে দেবেন ঠিক আছে! তার আগে মন-মানসিকতা তৈরি হোক। এগুলো পড়তে পড়তে ইয়াকীন বাড়ুক। ইয়াকীনের স্তর বাড়বে খোদ-বখোদ বেতন নেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। বিমান যখন স্টার্ট দেওয়া হয় সাথে সাথে ওপরের দিকে ওঠে না। ঘুরতে ঘুরতে যখন তার মধ্যে উড্ডয়নের ক্ষমতা তৈরি হয় তখন এমনিতে ওপরের দিকে উঠে যায়। ইয়াকীন যত বাড়বে এমনিতেই বেতন নেওয়া ছেড়ে দেবেন। তবে ইয়াকীন বাড়ার জন্য আকাবীরদের কিতাব মুতালাআ করেন।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন রিযকে হালালের জন্য। আশপাশে কোথাও রিযকে হালাল পাবেন না। সারা দুনিয়ার কোনোখান থেকে রিযকে হালাল আসবে না। এর মধ্যে আপনি দু'আ করতে থাকুন। ইয়া আল্লাহ! রিযকে হালাল খাওয়ান। রিযকে হালালের দু'আ করতে থাকার পরও যদি হালাল রিযিক খেতে না পারেন তাহলে উপায় কী? কোনো ব্যবসায়ী কি সুদবিহীন ব্যবসা করে? আর যারা সুদবিহীন ব্যবসা করে, ওরা তো বেগুন তরকারি বিক্রেতা। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী! বর্তমান যুগে তো বেগুন বিক্রেতাও সুদি ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। গ্রামীণ ব্যাংকের বাস্তবতা তো এটাই। আগের ব্যাংকগুলো বড়লোকদের ঋণ দিত। আর গ্রামীণ ব্যাংক গরিবদের সুদের ওপর লোন দিচ্ছে। পুরো বাংলাদেশ বড় থেকে ছোট সবার ঘরে সুদ ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিছু বাকি ছিল, নেটওয়ার্ক বিজনেস তাদেরকেও সুদি লেনদেনের সাথে জড়িয়ে ফেলেছে।

নেট মানে জাল। জালের মতো নেটওয়ার্ক বিজনেস স্কিম আপনাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে। কত সুন্দর আকর্ষণীয় স্কিম আপনাদেরকে দেয়। ওরা বলে, ঘরে বসে থাকবেন তার পরও আপনাদের লাভ হবে? এই বিজনেস বিভিন্ন নামে আসছে। যেই নামেই আসুক না কেন জুয়া, সুদ, ক্বেমার ও গরর সব কিছু এগুলোর মধ্যে আছে। যে সম্পর্কে আপনারা হেদায়া কিতাবে বিস্তারিত পড়েছেন। গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে সুদি লেনদেন করছে মহিলারা, যারা গরিব। আর এমএলএম বা নেটওয়ার্ক বিজনেসের সাথে যারা জড়িত হচ্ছে তারা মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, মাদরাসার স্টাফ, শিক্ষকগণ এবং এক শ্রেণীর বেকার যুবকরা। কিছু বড় বড় আলেমও এর সাথে জড়িত হয়ে পড়েছেন। যা বড়ই আফসোসের বিষয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সব ধরনের সুদি কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের দলিল

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি নাকি বারোটি–এ সম্পর্কে মাযহাবের ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (রহ.)–এর মতে, ঈদের নামাযে বারো তাকবীর দিতে হবে। আর ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, উভয় ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি।

ছয় তাকবীরের দলিলের আলোচনার আগে জেনে নেওয়া উচিত যে তাকবীরসংক্রান্ত ইমামদের এ ইখতেলাফ শুধু উত্তম অনুত্তম নিয়ে। অর্থাৎ যাঁরা বারো তাকবীরের কথা বলেন তাঁদের মতে ছয় তাকবীর দিলেও নামায হয়ে যাবে। কিন্তু বারো তাকবীর দেওয়া উত্তম। এমনিভাবে যাঁরা ছয় তাকবীরের কথা বলেন তাঁদের মতে বারো তাকবীর দিলেও নামায হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো, ছয় তাকবীর দেওয়া। কেননা উভয় পদ্ধতি সাহাবাদের আমল থেকে সহীহ সনদে সাব্যস্ত। তাই এক মত গ্রহণ করলে অপরটিকে তুচ্ছজ্ঞান করা যাবে না। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বেশ সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন : 'সলফে সালেহীনের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে নামায, দু'আ, যিকির ইত্যাদি আদায় করেছেন। আর প্রত্যেক ইমামের ছাত্রগণ ও তাঁর দেশবাসী উক্ত ইমামের অনুসৃত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কখনো প্রত্যেক ইমামের অনুসৃত পদ্ধতি (জায়েয ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে) এক মানের হয়, আবার কখনো কারো অনুসৃত পদ্ধতি অপরের পদ্ধতি থেকে উত্তম হয়ে থাকে–এমন ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হলো, শরীয়ত সমর্থিত দলিল ছাড়া একের মতকে অন্যের মতের ওপর প্রাধান্য না দেওয়া। তবে হ্যাঁ, দলিলে শরয়ীর ভিত্তিতে যদি কোনো এক পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করে, সেটার ওপর আমল করা উচিত। এতদসত্ত্বেও কেউ অন্য কোনো জায়েয পদ্ধতির অনুসরণ করলে তাকে দোষারোপ করা যাবে না।' (আদাবুল ইখতিলাফ ১১৪ পৃ.)

এ হলো উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতামত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আমাদের আহলে হাদীস বন্ধুদের কাছে মাননীয় ও বরণীয়। তা সত্ত্বেও তারা আজ নামাযসংক্রান্ত এমন সব উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের ইখতেলাফ নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করছে, যেসব ইখতেলাফ শত শত বছর পূর্বে মিটে গেছে। এসব ইখতেলাফী মাসআলা নিয়ে তারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। সরল প্রাণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ভারত উপমহাদেশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুসলমানদের আবাসস্থল। এখানের মুসলমানদের অন্তরে হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করাই বোধ হয় বর্তমান আহলে হাদীস বন্ধুদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। লা-মাযহাবী বন্ধুদের পক্ষ থেকে প্রোপাগাণ্ডার শিকার একটি মাসআলা হলো ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের মাসআলা। আহলে হাদীস বন্ধুরা বলতে চায়, ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোনো হাদীস নেই, অথচ বারো তাকবীরের পক্ষে অনেক হাদীস আছে। তাই ঈদের নামাযে বারো তাকবীরই দিতে হবে। ছয় তাকবীর দিলে নামায হবে না।

আমরা ইনশাআল্লাহ ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের যথার্থতা উল্লেখ করে বারো তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোর সমুচিত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুসলমান ভাইদের আস্থা হানাফী মাযহাবের ওপর অটুট থাকে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা আর কোনো হানাফী ভাইকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

জেনে নেওয়া উচিত যে হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরকে বিভিন্নভাবে বোঝানো হয়েছে। কোনো হাদীসে ঈদের নামাযে নয় তাকবীর বলা হয়েছে। এমনিভাবে কোনো হাদীসে দুই রাক'আতে চারটি করে মোট আট তাকবীরের কথা এসেছে। কিন্তু কোনো ইমামই ঈদের নামাযে নয় বা আট তাকবীরের প্রবক্তা নন। তাহলে বোঝা গেল, নয় বা আটের বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে। মূল হাদীস উল্লেখ করার আগে সেই ব্যাখ্যা জেনে নিলে সামনের কথা বোঝা সহজ হবে।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে ঈদের নামাযের প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা, অতিরিক্ত তিন তাকবীর ও রুকুর তাকবীরসহ মোট তাকবীর হয় পাঁচটি। আর তৃতীয় রাক'আতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর ও

রুকুর তাকবীরসহ তাকবীর হয় চারটি। অতএব ফলাফল দাঁড়াল ৫+৪=৯। হাদীসে যেখানেই নয় তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, সেখানে নয়-এর ব্যাখ্যা এটাই। অর্থাৎ দুই রাক'আতে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর আর দুই রাক'আতের রুকুর দুই তাকবীর এবং তাকবীরে তাহরীমার এক তাকবীরসহ মোট নয় তাকবীর। আর চার চার আট তাকবীরের ব্যাখ্যা হলো, প্রথম রাক'আতে রুকুর তাকবীর বাদ দিয়ে অতিরিক্ত তিন তাকবীর এবং তাকবীরে তাহরীমাসহ মোট তাকবীর চারটি। আর দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর তাকবীর ও অতিরিক্ত তিন তাকবীরসহ মোট তাকবীর চারটি। ফলাফল ৪+৪=৮। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসের যেখানেই দুই রাক'আতে চারটি করে আট তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, সেখানে মূলত অতিরিক্ত ছয় তাকবীরই উদ্দেশ্য; বাকিগুলো অন্য তাকবীর। এখন আমরা হাদীস উল্লেখ করছি :

১.

عن القاسم ابى عبد الرحمن قال : حدثنى بعض اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال :صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر اربعا واربعا ثم اقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال :لاتنسوا كتكبير الجنائز واشار باصابعه وقبض ابهامه .رواه الطحاوى وقال هذا حديث حسن الاسناد.

'প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু আব্দুর রহমান কাসিম বলেন, আমাকে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের দিন আমাদের নামায পড়ান এবং চারটি করে তাকবীর দেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করেন 'ভুলো না যেন, তারপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ করে বাকি চার অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করে বললেন, জানাযার তাকবীরের মতো (ঈদের নামাযেও প্রতি রাক'আতে চারটি করে তাকবীর)। ইমাম তহাবী (রহ.) এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (তহাবী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭১)

২.

عن مكحول قال :أخبرنى ابوعائشة جليس لابى هريرةؓ ان سعيد بن العاص سأل أباموسى الاشعرى وحذيفةبن اليمانؓ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الأضحى والفطر؟ فقال ابوموسى :كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة :صدق فقال ابوموسى :كذالك كنت اكبر فى البصرة حيث كنت عليهم .قال ابو عائشة وانا حاضر سعيدبن العاص

'প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম মকহুল দামেস্কি বলেছেন, আমাকে আবু হুরায়রা (রা.)-এর একজন সঙ্গী আবু আয়েশা আল উমাবী জানিয়েছেন যে (কুফার আমীর) সাঈদ ইবনুল আস আবু মুসা আশআরী ও হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, নবীজি (সা.) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে কয় তাকবীর দিতেন? আবু মুসা উত্তরে বললেন, একেক রাক'আতে জানাযার তাকবীরের সমসংখ্যক (চার) তাকবীর দিতেন। হুযাইফা (রা.) আবু মুসা (রা.)-কে সমর্থন করে বললেন, তিনি ঠিক বলেছেন। আবু মুসা (রা.) আরো বললেন, আমি যখন বসরার আমীর ছিলাম তখন আমি সেখানে এভাবে প্রতি রাক'আতে চার তাকবীর দিতাম। আবু আয়েশা বলেন, সাঈদ ইবনুল আসের এই প্রশ্নের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। (সুনানে আবু দাউদ : ১/১৬৩, মুসনাদে আহমাদ : ৪/৪১৬) সনদের বিবেচনায় হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা জানতে 'আসারুস সুনান : ৩১৫ পৃ. টীকা দ্রষ্টব্য। আর চার তাকবীরের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা যে তিন তাকবীর তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।)

৩.

عن كردوس قال :كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يكبر فى الاضحى والفطر تسعا تسعا .يبدأ فيكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر واحدة فيركع بها ثم يقوم فى الركعة الاخرة فيبدأ فيقرأ ثم يكبر اربعا يركع باحداهن .قال الهيثمى :رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات.

'বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত কুরদূস (রহ.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে নয়টি করে তাকবীর দিতেন। নামাযের শুরুতে চারটি তাকবীর দিতেন (তিনটি অতিরিক্ত আর একটি তাহরীমার) তারপর কিরাত পড়তেন। অতঃপর এক তাকবীর বলে রুকু করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে কিরাত পড়ে আবারো মোট চারটি তাকবীর দিতেন, যার একটি দিয়ে রুকু করতেন।' এই হাদীস সম্পর্কে হাফেজে হাদীস আল্লামা হাইছামী (রহ.) বলেন, এই হাদীসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (মাজামাউয্যাওয়ায়েদ ২/৩৬৭ হা. নং ৩২৪৯)

অতএব, হায়ছামী (রহ.)-এর উক্তি অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ। আর আল্লামা নিমাভী (রহ.) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, হাসান ও সহীহ উভয় প্রকারের হাদীসই আমলের ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য।

৪.

عن علقمة والاسود قالا :كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وابوموسى رضى الله عنهم فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير فى صلاة العيد فقال حذيفة سل الاشعرى ,فقال الاشعرى سل عبد الله فانه اقدمنا واعلمنا, فسأله ,فقال ابن مسعود يكبر اربعا ثم

(তাহযীবুল কামাল : ২/২৭৯) এই আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, এই হাদীসটিও সহীহ।

৭.

أخرج ابن ابى شيبة عن ابى اسامة عن سعيدبن عروبة عن قتادة عن جابربن عبد الله و سعيد بن المسيب انهما قالا : تسع تكبيرات ويوالى بين القراءة

'হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ.) (তিনি তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বলেন, ঈদের নামাযে মোট নয়টি তাকবীর হবে। আর উভয় রাক'আতে কিরাত অবিচ্ছিন্ন ধারায় হবে। (অর্থাৎ উভয় রাক'আতের কিরাতে মাঝে কোনো অতিরিক্ত তাকবীর হবে না।) (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৪/২১৬)

এই হাদীসের রাবী সাঈদ ইবনে আবী আরুবা এবং কাতাদা সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। আর আবু উসামা সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেছেন, 'তিনি শীর্ষস্থানীয়দের একজন', ইমাম আহমদ ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেছেন, 'তিনি নির্ভরযোগ্য'। (সিয়ারু আ'লামিননুবালা : ৮/১৭৬) অতএব, এই হাদীসটির সনদও সহীহ।

৮.

عن عبد الله بن الحارث قال شهدت ابن عباس كبر فى صلوة العيد بالبصرة تسع تكبيرات و والى بين القرائتين . قال وشهدت المغيرة بن شعبة فعل مثل ذالك

তাবেয়ী হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারেস বর্ণনা করেন যে আমি বসরায় ইবনে আব্বাস (রা.)-কে ঈদের নামাযে মোট নয়টি তাকবীর দিতে দেখেছি এবং তিনি উভয় রাক'আতের কিরাত অবিচ্ছিন্নভাবে আদায় করেছেন। আর মুগীরা বিন শু'বাহ (রা.)-কেও আমি এরূপ করতে দেখেছি। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৩/২৯৪, হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী (রহ.) এই হাদীসটিকে يقرأ ثم يكبر فيركع فيقوم فى الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا بعد القراءة.

'আলকমা ও আসওয়াদ (রহ.) বলেছেন, একদা ইবনে মাসঊদ, হুযাইফা ও আবু মুসা আশআরী (রা.) বসেছিলেন। তখন সাঈদ ইবনুল আস তাঁদের নিকট ঈদের নামাযে তাকবীরের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে হুযাইফা (রা.) বললেন, আশআরী ভাইকে জিজ্ঞেস করো। আর আবু মুসা আশআরী (রা.) বললেন, ইবনে মাসঊদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করো। কেননা তিনি আমাদের মধ্যে প্রবীণ ও বেশি ইলমের অধিকারী। সর্বশেষে সাঈদ ইবনুল আস ইবনে মাসঊদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নামায শুরু করে চারটি তাকবীর দেবে (তাকবীরে তাহরীমাসহ অতিরিক্ত তিনটি) তারপর কিরাত পড়ে তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে প্রথমে কিরাত পড়বে তারপর চারটি তাকবীর দেবে (অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি আর রুকুর একটি)। মুহাল্লা বিল আসার ৩/২৯৫, ইবনে হাযাম যাহেরী ও নিমাভী (রহ.) এই হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন। (মুসান্নাফে অব্দুর রাজ্জাক হা. ৫৬৮৭ আছারুস সুনান, পৃ. ৩১৫)

৫.

عن عبد الله بن الحارث (هو ابن نوفل) قال :كبر ابن عباس رضى الله عنه يوم العيد فى الركعة الاولى اربع تكبيرات ثم قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الصلاة. (اخرجه ابن حزم الظاهرى فى المحلى بالاثار٣/٢٩٥ دارالكتب .وقال فى سند هذا الاثر و الاثر الذى قبله :هذان اسنادان فى غاية الصحة و به تعلق ابوحنيفة رحمه الله)

'আব্দুল্লাহ বিন হারেস বিন নাওফেল বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ঈদের দিন প্রথম রাক'আতে চারটি তাকবীর দেন (অতিরিক্ত তিনটি ও রুকুর একটি)। অতঃপর কিরাত পড়েন, এরপর রুকু করেন। দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে প্রথমে কিরাত পড়লেন এরপর নামাযের অন্যান্য তাকবীর ছাড়া অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর দিলেন।'

ইবনে হাযাম (রহ.) এই হাদীসটি এবং এর পূর্বে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেন, 'এই উভয় হাদীসের সনদ সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহীহ।' ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর দ্বারাই দলিল দেন।' (মুহাল্লা বিল আছার ৩/২৯৫)

৬.

اخرج ابن ابى شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن اشعث عن محمد بن سيرين عن انس رضى الله عنه انه كان يكبر فى العيد تسعا...

'ইবনে আবী শাইবা ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান থেকে তিনি আশআছ থেকে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে হযরত আনাস (রা.) ঈদের নামাযে মোট নয় তাকবীর দিতেন।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৪৯৫)

এই আছারের রাবী ইবনে আবী শাইবা, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান এবং মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন সকলেই সুপ্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। আর আশআছ সম্পর্কে ইমাম জামালুদ্দীন মিয্যী (রা.) বলেন :

هواشعث بن عبد الملك ,قال يحيى بن سعيد :هو عندى ثقة مامون ,وقال ابن معين :اشعث ثقة وكذالك قال النسائى ,وقال ابوحاتم :لابأس به.

'তাঁর পিতার নাম আব্দুল মালেক। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি আমার মতে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল। ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, আশআছ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, ইমাম নাসাঈ ও তাঁর সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন। আর ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেছেন, (হাদীসের ক্ষেত্রে) তাঁর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই।

সহীহ বলেছেন। দেখুন, দেরায়া : ১/১১০)

উল্লেখ্য, এ উভয় হাদীসে নয় তাকবীরের মধ্যে ছয়টি অতিরিক্ত আর তিনটি নামাযের স্বাভাবিক তাকবীর। যেমন শুরুতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর সম্পর্কে আরো কিছু আসার পাওয়া যায়, যা সংক্ষেপ করণার্থে আমরা এখানে উল্লেখ করলাম না। তবে যেসব সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে ছয় তাকবীরের আমল সহীহ সনদে প্রমাণিত তাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১.হযরত উমর (রা.) (শরহু মাআনিল আসার : ১/৩১৯)
২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.)
৩. হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)
৪. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)
৫. হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা.
৬. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)
৭. হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা.)
৮. হযরত মুগীরা বিন শু'বাহ (রা.)
৯. হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৩/২৯১)
১০. হযরত বারা বিন আযেব (রা.)
১১. হযরত হাজ্জাজ বিন মালেক
১২. হযরত আবুত তুফায়েল আমের বিন ওয়াসেলা
১৩. হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ
১৪. হযরত ইমরান বিন হুসাইন
১৫. হযরত আবু রাফে (রা.)
১৬. হযরত আবু উমামা আল বাহেলী

বি.দ্র. : ১০-১৬ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.)-এর শাগরেদ। আর ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) থেকে সহীহ সনদে সাব্যস্ত রয়েছে যে, 'আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা.)-এর শাগরেদগণ ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর দিতেন।' (দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৪/২২০)

বিশিষ্ট যেসব তাবেয়ী হযরাত ছয় তাকবীরের ওপর আমল করতেন

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে বর্ণিত : তাবেয়ীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনজন :

১. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব
২. আলকমা বিন কায়েস
৩.আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ (আততাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ পৃ. ২৫৫)।

এ তিনজনই ছয় তাকবীরের ওপর আমল করতেন।

৪. কতাদা বিন দিআমা
৫. আবু কিলাবা
৬. আবু জা'ফর (রহ.) (দেখুন মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৪/২১৭ শায়েখ আওয়ামার তাহকীক)

মারফূ হাদীস, আসারে সাহাবা এবং আসারে তাবেঈন দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য সনদে নবীজি (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে প্রমাণিত। এতদসত্ত্বেও যারা ছয় তাকবীর নিয়ে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তারা মূলত মুসলিম সমাজে অনৈক্য, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে ইহুদি-খ্রিস্টানদের সাহায্য করছে।

বারো তাকবীরের পক্ষে লা-মাযহাবী বন্ধুরা যেসব হাদীস পেশ করে থাকেন তার পর্যালোচনা

عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين فى الاولى سبعا قبل القراءة وفى الاخرة خمسا قبل القراءة

১. কাসীর ইবনে আব্দুল্লাহ স্বীয় সূত্রে নবীজি (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে নবীজি (সা.) উভয় ঈদের প্রথম রাক'আতে কিরাতের পূর্বে সাত তাকবীর দিতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন। (সুনানে তিরমিযী : ১/১১১)

সনদ সম্পর্কে আমাদের কথা : এ হাদীসটি কাসীর বিন আব্দুল্লাহ (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত। আমরা কাসীর বিন আব্দুল্লাহ সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদ ইমামদের মন্তব্য তুলে ধরছি। যাতে বোঝা যায় যে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য কি না?

ইমাম আহমাদ (রহ.) কাসীর সম্পর্কে বলেন,

منكر الحديث ليس بشىء

'তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত, তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।' রিজাল শাস্ত্রের আরেক দিকপাল ইয়াইইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তানও তার সম্পর্কে ليس بشىء বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম শাফেয়ী কাসীর সম্পর্কে বলেছেন, ذاك احد الكذابين 'সে একজন মিথ্যুক।' ইমাম আবু যুরআহ বলেছেন, واهى الحديث ليس بقوى 'সে মনগড়া হাদীস বয়ান করে আর সে অতি দুর্বল বর্ণনাকারী।' ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী (রহ.) বলেছেন, متروك الحديث 'তার হাদীস পরিত্যাজ্য।' (দেখুন তাহযীবুত তাহযীব : ৬/৫৫৮)

হাদীস বিশারদ ও রিজাল শাস্ত্রবিদ ইমামগণের মন্তব্য দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে কাসীর বিন আব্দুল্লাহ একজ অগ্রহণযোগ্য রাবী। তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস প্রমাণ উপযুক্ত নয়। অতএব, এ হাদীসটি বারো তাকবীর প্রমাণের উপযুক্ত নয়।

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه صلى صلاة العيد فكبر فى الاولى سبعا وفى الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة .(سنن البيهقى ٣/٤١٢)

১. হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি ঈদের নামায পড়ার সময় প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর দিলেন আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিলেন এবং প্রত্যেক তাকবীরের সাথে হাত উঠালেন। (সুনানে বাইহাকী : ৩/৪১২)

আমাদের কথা : হযরত উমর (রা.)-এর আমল সম্পর্কে বর্ণিত এই আসারের

সনদে ইফরীকী নামক একজন রাবী রয়েছেন। যাঁর মূল নাম আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম। এই ইফরীকী সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) বলেছেন, ضعف يحيى الافريقى 'ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) ইফরীকীকে যয়ীফ বলেছেন।' আর আব্দুর রহমান বিন মাহদী ইফরীকী সম্পর্কে বলেছেন, اما الافريقى فما ينبغى ان يروى حديثا عنه 'আর ইফরীকী, সে তো এমন যে তার থেকে একটি হাদীসও বর্ণনা করা উচিত নয়।' ইমাম আহমাদ তার সম্পর্কে বলেছেন, ليس بشيء 'তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।' ইমাম নাসাঈ তাকে 'যয়ীফ' বলেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব : ৫/৮৬) হাদীস শাস্ত্রের এসব বিদগ্ধ ইমামদের মন্তব্য দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে ইফরীকী একজন 'যয়ীফ' রাবী। অতএব, তার সূত্রে বর্ণিত হযরত উমর (রা.)-এর আমল সম্পর্কীয় আসারটি দলিলযোগ্য হতে পারে না।

তা ছাড়া হযরত উমর (রা.) থেকে ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের ওপর আমল সুপ্রমাণিত। ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, নবীজি (সা.)-এর ইন্তেকালের পর এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিল যে, জানাযার নামাযে তাকবীর সংখ্যা কত হবে চার, পাঁচ? নাকি সাতটি? এই মতভেদ নিরসনে হযরত উমর (রা.) নিজ খেলাফতকালে সাহাবায়ে কেরামকে একত্র করে বললেন, 'আপনারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী। কোনো বিষয়ে আপনাদের মতৈক্য বা মতানৈক্য পরবর্তীদের মধ্যে মতৈক্য বা মতানৈক্য সৃষ্টি করবে। তাঁর এ কথা শুনে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমীরুল মুমিনীন আপনি ঠিক বলেছেন। আলোচিত বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত আমাদেরকে বলুন। উমর (রা.) বললেন, বরং আপনারা আপনাদের মতামত বলুন, কেননা আমিও আপনাদের মতোই একজন মানুষ। এরপর সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর মতবিনিময় করলেন এবং এ বিষয়ে একমত হলেন যে যেভাবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় চার চার তাকবীর হয়ে থাকে সেভাবে জানাযার নামাযেও চার তাকবীর হবে। (শরহু মাআনিল আসার : ১/৩১৯)

বি.দ্র. : ঈদ ও জানাযার তাকবীরের ব্যাপারে নবীজি (সা.) থেকে বিভিন্ন রকম আমল পাওয়া যায়। তবে এ কথা ঠিক যে নবীজি (সা.)-এর শেষ আমল ছিল চার চার তাকবীর। যে চারটির তিনটি অতিরিক্ত হবে। এ জন্যই এ ব্যাপারে সকলে একমত হয়ে গেলেন।

এই হাদীস দ্বারা এ কথা বোঝা গেল যে ঈদের নামাযে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ চার তাকবীর হওয়া একটি স্বীকৃত বিষয় ছিল। যার কারণে জানাযার তাকবীরের সমাধান ঈদের তাকবীরের সাথে তুলনা করে করা হলো। এই ঘটনা দ্বারা এ কথাও বুঝে আসে যে হযরত উমর (রা.)সহ ওই মজলিসে উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কেরামই দুই ঈদে ছয় তাকবীরের প্রবক্তা ছিলেন।

অতএব, হযরত উমর (রা.) থেকে বারো তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত আসার সম্পর্কে আমরা এ কথা বলতে পারি যে দুই কারণে উক্ত আসার গ্রহণযোগ্য নয়। ১. এই আসারের রাবী ইফরীকী যয়ীফ ২. হযরত উমর (রা.) থেকে দুই ঈদে ছয় তাকবীর প্রমাণিত।

عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى العيدين سبعا و خمسا قبل القراءة .

৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবীজি (সা.) উভয় ঈদের নামাযে কিরাতের পূর্বে সাতটি ও পাঁচটি করে তাকবীর দিতেন। (মুসনাদে আহমাদ : ৬/৬৫)

عن عمروبن العاص رضى الله قال قال النبى صلى الله عليه وسلم التكبير فى الفطر سبع فى الاولى وخمس فى الاخرة القراءة بعدهما كلتيهما

৪. হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত নবীজি (সা.) বলেছেন, ঈদুল ফিতরের প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর। উভয় রাক'আতে তাকবীরের পরেই কিরাত। (সুনানে আবু দাউদ : ১/১৬৩)

৩ ও ৪ নং হাদীস সম্পর্কে আমাদের কথা : গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের অনুসৃত ইমাম ইবনে হাযাম (রহ.) স্বীয় কিতাব মুহাল্লা বিল আসার-এ হযরত আয়েশা ও আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস দুটি উল্লেখ করার পর বলেন, وهذا كله لا يصح 'এ দুটির একটিও সহীহ নয়।' (দেখুন, মুহাল্লা বিল আসার : ৩/২৯৬)

তা ছাড়া হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে বোখারী (রহ.)ও যয়ীফ আখ্যা দিয়েছেন। (প্রাগুক্ত-টীকা দ্রষ্টব্য।) আর ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (রহ) এ উভয় হাদীসের সনদকে 'ফাসেদ' বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী (রহ.) তা সমর্থন করেছেন। (দেখুন : আল মুস্তাদরাক : ১/২৯৮)

عن نافع انه قال شهدت الاضحى والفطر مع ابى هريرة فكبر فى الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفى الاخرة خمس تكبيرات قبل القراءة

৫. নাফে (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.)-এর সাথে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা পড়েছি। তো তিনি প্রথম রাক'আতে কিরাতের পূর্বে সাত তাকবীর দিলেন আর দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন। (মুআত্তা ইমাম মালেক : ১/২৩৯)

আমাদের কথা : আবু হুরায়রা (রা.)-এর আমল সম্পর্কীয় এই আসারটির সনদ সহীহ। এই একটিমাত্র আসার ছাড়া বারো তাকবীর সম্পর্কীয় অন্য সব মরফূ এবং গায়রে মারফূ হাদীস যয়ীফ তথা প্রমাণযোগ্য নয়। ইমাম আহমাদ বারো তাকবীরের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও বলেছেন,

ليس يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى تكبير العيدين حديث صحيح

ঈদের নামাযে তাকবীর সংখ্যা সম্পর্কে কোনো সহীহ মারফূ হাদীস নেই।'

(নসবুর রায়াহ : ৩/২৮৯, উল্লেখ্য, ছয় তাকবীরের পক্ষে উল্লিখিত মারফূ হাদীসগুলো হাসান পর্যায়ের। অতএব, ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর এ কথা দ্বারা আমাদের দলিল খণ্ডন হয় না।)

এখানে কয়েকটি বিষয় বোঝার রয়েছে, যথা : ক. আবু হুরায়রা (রা.)-এর আমলটি স্বয়ং নবীজি (সা.)-এর সুস্পষ্ট ঘোষণাও হুকুমের খেলাফ (আমাদের দলিলের প্রথম হাদীস দেখুন)। আর নবীজি (সা.)-এর হুকুমের বরখেলাফ কোনো সাহাবীর আমল গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হতে পারে ওই ব্যাপারে নবীজি (সা.)-এর হুকুম তিনি জানতে পারেননি। এমন অনেক ঘটনা হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান।

খ. অথবা কোনো এক জমানায় নবীজি (সা.) বারো তাকবীরে ঈদের নামায পড়িয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা তরক করে ছয় তাকবীরে ঈদের নামায পড়িয়েছেন। আর এ খবর হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর নিকট পৌঁছেনি। তাই তিনি প্রথম যুগের বারো তাকবীরের ওপর আমল করেছেন। নবীজি (সা.)-এর সর্বশেষ আমল জানা থাকলে কখনো তিনি তার খেলাফ করতেন না।

গ. আবু হুরায়রা (রা.)-এর আমলটি বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের আমলের খেলাফ। এমতাবস্থায় বড় বড় সাহাবার আমল বাদ দিয়ে শুধু তার একার আমল গ্রহণ করা উচিত হবে না।

ঘ. এই তাকবীরগুলো নামাযের অংশ নয়, বরং অতিরিক্ত জিনিস। আর শরীয়তের নীতি হলো, অতিরিক্ত জিনিস নামাযে দাখেল করতে হলে তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে হবে। তো ছয় ও বারো তাকবীরের ইখতিলাফের মধ্যে ছয় তাকবীর নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত। কারণ যাঁরা বারো তাকবীরের কথা বলেন তাঁরাও ছয় তাকবীরকে মানেন। কেননা বারোর মধ্যে ছয় আছে। কিন্তু বারো তাকবীরের বিষয়টি এমন নয়। কেননা বারো তাকবীরকে সকলে স্বীকার করে না। বরং ছয় তাকবীরের প্রবক্তাগণ প্রকারান্তরে বারো তাকবীরকে অস্বীকার করেন। অতএব, অনিশ্চিত বিষয়কে নামাযের মধ্যে দাখেল করা উচিত হবে না। তাই আমরা এ কথা বলতে পারি যে হানাফীদের আমল সকল দিক বিবেচনায় মজবুত ও সহীহ।

ঈদ : উৎসব ও ইবাদত

মাওলানা শরীফ উসমানি

'ঈদ' শব্দটির আরবী শব্দমূল 'আউদ'। এর অর্থ যা ফিরে ফিরে বারবার আসে। 'ফিতর' শব্দের অর্থ ভেঙে দেওয়া, ইফতার করা। ঈদুল ফিতর মানে সে আনন্দঘন উৎসব, যা দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর আসে। আসে সুশৃঙ্খল আচার-আচরণের তীর ঘেঁষে। নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিক পরিশুদ্ধির সীমানা পেরিয়ে সামষ্টিক কল্যাণ নিয়ে ঈদ আসে। ঈদ আসে কৃচ্ছ্র ও শুদ্ধতার প্রতীক হয়ে। তাকওয়ার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নতুন জীবনে ফেরার অঙ্গীকার নিয়ে ঈদ আসে। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতমণ্ডিত অফুরন্ত কল্যাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করে ঈদ আসে। ঈদ আসে শত্রুতা ও বৈরিতার প্রাচীর ডিঙিয়ে বন্ধুতা ও মিত্রতার হাত বাড়িয়ে। ঈদ আসে মহামিলনের মহোৎসবে মনকে মাতিয়ে তুলতে, পরিশোধিত হৃদয়ে পরিতৃপ্তির ছোঁয়া লাগাতে।

ঈদুল ফিতর একাধারে আনন্দোৎসব ও ইবাদত। এ আনন্দ আল্লাহর রহমত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির, জাহান্নাম থেকে মুক্তির। এ আনন্দ সিয়াম-কিয়ামের শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতার। এ আনন্দে নেই কোনো অশ্লীলতা ও পাপ-পঙ্কিলতা। এ আনন্দে কেবলই সওয়াব ও পূর্ণময়তা। ধীরে ধীরে এ আনন্দ সংক্রমিত হতে থাকে হৃদয় থেকে হৃদয়ে। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা–সবার দেহ-মনে ঈদের ছোঁয়া লাগে। হতদরিদ্র, এতিম, দুস্থ, নিঃস্ব ও শত শত ছিন্নমূল মানুষের মুখেও হাসি ফোটে কিছু টাকা, কিছু নতুন কাপড় পেয়ে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ী ও কর্মজীবীরাও এ সময় ব্যস্ত হয়ে পড়েন সমানতালে। ঈদ উপলক্ষে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা তাঁরাও ভোগ করেন। এভাবেই সর্বজনীন হয়ে ওঠে ঈদ।

ঈদ মানেই আনন্দ। ঈদুল ফিতর অর্থ রোজা খোলার আনন্দ। কিন্তু কেন সেই আনন্দ? আনন্দের জন্য তো কোনো কারণ থাকতে হবে! সুখবর পেলেই তো মানুষ আনন্দিত হয়! এক মাস রোজার সাধনার পর এই দিনে সেই সাধনার পুরস্কার হিসেবে ক্ষমা পাওয়াই সেই আনন্দের কারণ। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ঈদের দিন ফেরেশতাদের মধ্যে রোজাদারদের নিয়ে গর্ব করে বলেন, 'হে ফেরেশতারা! আমার কর্তব্যপরায়ণ প্রেমিক বান্দার বিনিময় কী হতে পারে?' ফেরেশতারা বলেন, 'হে প্রভু! পুণ্যরূপে পুরস্কার দান করাই তো তার প্রতিদান।' আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব (রোজা) পালন করেছে। অতঃপর দু'আ করতে করতে ঈদগাহে গমন করেছে। সুতরাং আমার মর্যাদা, সম্মান, দয়া ও বড়ত্বের কসম! আমি তাদের দু'আ কবুল করব এবং তাদের মাফ করে দেব।' (বায়হাকি : ৩/৩৪৩)

ঈদ মানে আনন্দ-উৎসব। এটি মুসলমানদের মৌলিক সংস্কৃতি। ইসলামের নবীর দেওয়া ধর্মীয় আনন্দ-উৎসব। ঈদ সংস্কৃতির আরশিতে দেখা যায় আপনার ভালোবাসার চেহারা। সুখ বিলাসের মহা তিথি। অন্যকে ভালোবেসে জীবন ত্যাগের পবিত্র করার মাহেন্দ্রক্ষণ।

ইসলামপূর্ব পৃথিবীর মানুষের জন্য বিভিন্ন আনন্দ-উৎসব ছিল। তাদের নিজস্ব মনগড়া বানানো সংস্কৃতির চর্চা হতো। বিভিন্ন দিন-তারিখকে কেন্দ্র করে আনন্দের ঢাকঢোল বাজাত। তাদের সংস্কৃতি কিংবা আনন্দ উৎসবে ছিল না সভ্যতার শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার দৃষ্টান্ত। তাদের উৎসব ছিল না সবার জন্য সমান উন্মুক্ত ও ভেদাভেদমুক্ত। তাদের উৎসব অনুষ্ঠান পার্থক্য তৈরি করে রাখত এলিট ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। বৈষম্য সৃষ্টি করত বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে। বিত্তশালীরা বিপুল বৈভবে-ঐশ্বর্যে একধাপ এগিয়ে যেত আর বিত্তহীনরা নিষ্পেষিত হতো বিত্তশালীদের ঘৃণার নিকৃষ্ট মনমানসিকতার যাঁতাকলে।

মুসলমানদের ঈদ সংস্কৃতির আগে পারস্যে 'নাইরোজ' ও 'মেহেরজান' নামে দুটি উৎসব পালিত হতো। দুটি উৎসবই পারস্য সংস্কৃতি সভ্যতার দর্পণ। বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে নাইরোজ ও বসন্ত উৎসবকে উপলক্ষে করে নাইরোজ ও মেহেরজান নামে দুটি বিনোদনি উৎসব পালন করত। অপরিশুদ্ধ মানব মননে আবিষ্কৃত দুটি উৎসবই বেহায়াপনা-বেলাল্লাপনা ও অশ্লীলতার কালো নিকৃষ্ট আঁধারে ছিল নিমজ্জিত। শ্রেণী বৈষম্যের অভিশপ্ত দেয়ালে ছিল অবরুদ্ধ। তাদের ভিত্তিহীন সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে শুদ্ধ সংস্কৃতির উদ্‌যাপনের পাঠ দিলেন মানবতার নবী মুহাম্মদ (সা.)। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, 'প্রত্যেক জাতির আনন্দ-উৎসব আছে। আর আমাদের

আনন্দ-উৎসব হলো দুই ঈদ।' (বোখারী, হাদীস : ৯৫২)

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘোষণার মাধ্যমে দ্বিতীয় হিজরীতে ঈদ উৎসবের গোড়াপত্তন হয়। সেই ঈদ এখন চলমান পৃথিবীর সবচেয়ে শুদ্ধতম আনন্দ-উৎসবের সংস্কৃতি। সব মুসলমান প্রতিবছর দুবার ভাসেন আনন্দের জোয়ারে, বাধহীন খুশির ফল্গুধারায়। বছরের প্রথম ঈদ ঈদুল ফিতর পালন করা হয় শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে। পবিত্র রমাজান মাসের রোজাব্রত পালন শেষে যখন পশ্চিম আকাশে এক ফালি চাঁদ মুচকি হেসে উদয় হয়, তখন সব শ্রেণীর মুসলমানের হৃদয় পুলকিত হয় আনন্দের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। আকাশ-বাতাসে গুঞ্জরিত হয় মহাসুখের হিরন্ময় বার্তা। প্রকৃত অর্থে এক মাস কঠোর সিয়াম সাধনা পালনের পুরস্কার ঘোষণার মহা তিথি হলো এই দিন। আর জিলহজ মাসের ১০ তারিখে পালিত হয় ঈদুল আজহা। ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক স্বীয় তনয় ইসমাইল (আ.)-কে স্বপ্নযুগে আদিষ্ট হয়ে কোরবানী করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিধান আসে কোরবানীর ও ঈদুল আজহার। তাঁদের ত্যাগের সেই স্মৃতি ধারণ করতে পালন করা হয় ঈদুল আজহা।

ইসলামের দেওয়া দুটি আনন্দ উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। আমাদের ঈদ আমাদের শিক্ষা দেয় ত্যাগের। ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার। শ্রেণী বৈষম্যের মূলোৎপাটন করার। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গরিব-ধনী এক কাতারে চলার।

ঈদ সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছিল হাসতে হাসাতে, ভালোবাসতে ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হতে। প্রকৃত অর্থে আমরা কি ঈদ থেকে শিক্ষা নিতে পারছি হাসার, ভালোবাসা শেখার ও ত্যাগের সমুদ্দুরে স্নাত হওয়ার! কিন্তু আমরা কী শিক্ষা নিচ্ছি ঈদ হতে। কোন ধরনের সংস্কৃতির চর্চা করছি ঈদের আদলে? মানুষ আজ ঈদকে বানিয়ে ফেলেছে পার্থক্যের সুবিস্তৃত মাঠ। শ্রেণী বৈষম্যের নব্য পাঠশালা! ঈদের দিনে মানুষ হয়ে যাচ্ছে মানুষ থেকে ভিন্ন। এলিট, নিগৃহীত মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে যোজন যোজন ফারাক। পৃথিবীর এ বিচিত্র পাঠশালার মধ্যে আমরা ভুলে যাচ্ছি আমাদের সভ্যতার সংস্কৃতি ও শিকড়ের শিক্ষা ।

ঈদ আমাদের সেতু বন্ধনের এক বাহুডোরে বাঁধে। আমাদের একসঙ্গে মিলিত করে। সপ্তাহ, দিন, মাস ও বছর এবং কয়েক বছর ধরে না-দেখা মানুষের সঙ্গে দেখা হয় পবিত্র ঈদের এই দিনে। জীবনের কর্মব্যস্ততাকে অবসান দিয়ে, সমস্ত ঝামেলা উপেক্ষা করে মানুষ নাড়ির টানে ফিরে আসে নীড়ে। ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকরির পাট চুকিয়ে আনন্দচিত্তে প্রিয়জনদের কাছে ফিরে আসে দূরে থাকা মানুষটি। ঈদ এলে দূরত্ব ঘুচে যায় আমাদের মধ্যে। নানা রকম ঈদসামগ্রী, প্রিয়জনের জন্য বিভিন্ন গিফট মনের ক্যানভাসে ছবি এঁকে যায়। ভালোবেসে সবার জন্য হাতে উঠে আসে পছন্দের জামা-কাপড়। ঈদকে কেন্দ্র করে বসনে-ভূষণে মানুষ সেজেগুজে হয়ে যায় অভিনব সুন্দর শোভন। নতুন পোশাকের বাহারি আয়োজনে খুশিতে ফুরফুরে থাকে পরিবারের সবার মন। ধনীদের পাশাপাশি গরিবরাও পরে কারো দেওয়া কিংবা নিজের কষ্টের টাকায় কেনা নতুন জামা।

ঈদের বাঁকা শুভ্র চাঁদ দেখা যাওয়ার পর থেকে নির্বিশেষে সবার মনে যে আনন্দ খেলা করে, তার স্বাদ, রং ও গন্ধ ভিন্ন ও সুখকর। পাড়ার কিশোররা জেগে ওঠে ঈদ বরণের মিছিলে। মিঠাই খাবারের গন্ধে ম-ম করে পাড়ার অলিগলি। নতুন জামায় এক কাতারে সারিবদ্ধ দেখা যায় মানুষকে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাযে দাঁড়ায়। নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হয়ে রবের দরবারে শুদ্ধ প্রেমের হাজিরা দেয়। মানুষে মানুষে কুশল বিনিময়, মুসাফাহা যেন আমাদের শাশ্বত ঐহিত্য সংস্কৃতির সাক্ষী। মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আজকাল আমরা গলা টিপে হত্যা করছি আমাদের সভ্যতা ও শিকড়ের সংস্কৃতিকে। ঈদ এলেই ঈদের নামে চলে বেহায়াপনার প্রদর্শনী। ঈদ নাটক, ঈদ গান, ঈদের ছবি, ঈদ রেসিপি ও ঈদ ফ্যাশন বলে নোংরা সংস্কৃতির চর্চা করা হয়। সাত দিনব্যাপী চলে ঈদের নামে প্রহসন। চ্যানেলে চ্যানেলে ভাঁড়ামি, নষ্টামি প্রেম-পিরিতি নিয়ে চলে মাতামাতি। ইসলামের আবিষ্কৃত ঈদের উৎসবে থাকে না ইসলামের কোনো তাহজিব তামাদ্দুনের শিক্ষা। ইসলামের উদারতা মানবপ্রীতি নিয়ে আলোচনা হয় না কোনো খবরের কাগজ কিংবা টিভি চ্যানেলে। ঈদ উপলক্ষে করা ঈদ সংখ্যায় স্থান পায় না কোনো ইসলামী ঈদ রচনা-প্রবন্ধ-নিবন্ধ। ফিচার বা প্রতিবেদন হয় না কোনো ইসলামী ঐতিহ্য নিয়ে। কিংবা কোনো বিষয় নিয়ে হয় না আলোচনা। ইসলামের দেওয়া ঈদ উৎসবে চলে ভিন জাতীয় নোংরা সব কালচারের প্রদর্শন। সপ্তাহব্যাপী চলে বেহায়াপনার তোড়জোড় আস্ফালন।

ইসলামের নবীর প্রবর্তিত ঈদ উৎসব পালিত হোক শুদ্ধতার সরোবরে। বেহায়াপনা, নোংরা কুসংস্কার ও সংস্কৃতির তরী ডুবে যাক পবিত্রতার বরফে ধাক্কা লেগে। পৃথিবীর

আলো-বাতাসে গন্ধ ছড়াক আমাদের বিশুদ্ধ সংস্কৃতি ও শিকড়ের নাভির সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহ্য। আমাদের সংস্কৃতি সৃজনে ও নির্মাণে হোক পরকালমুখী।

ইসলাম বিনোদনকে সমর্থন করে; কিন্তু অশ্লীলতাকে মোটেও প্রশ্রয় দেয় না। ইসলামের উৎসবে ঢোল-তবলা নেই। বিনোদনের নামে অসামাজিকতা ও নগ্নতা নেই। নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ ইসলামে নিষিদ্ধ। ঈমানদারের ঈদের আনন্দ উত্তম পোশাক পরিধান, ঈদের দিন মিষ্টিমুখ করা, সদকাতুল ফিতর আদায় ও ঈদের নামায আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উৎসবের সঙ্গে মানুষের রুচি ও চাহিদার বিষয়টি জড়িত। অন্যদের উৎসব ও আমাদের উৎসবের মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। মুসলমানদের উৎসব অপসংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। উৎসবের নামে অনাচার, কদাচার, পাপাচার আর নৈতিকতাবিবর্জিত বল্গাহীন অনুষ্ঠান আড়ম্বরের অবকাশ নেই ইসলামে। আবার বৈধ ও নির্দোষ আনন্দ-ফুর্তি, শরীরচর্চামূলক খেলাধুলা, নৈতিক মূল্যবোধ ও ঈমানী ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ শিল্প-সংগীত এগুলোও ঈদের দিনের বৈধ আনুষ্ঠানিকতার বাইরে নয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ঈদের দিন হাবশিরা খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ক্রীড়ারত হাবশিদের উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, 'ছেলেরা, খেলে যাও! ইহুদিরা জানুক যে আমাদের দ্বীনের প্রশস্ততা আছে। আমাকে প্রশস্ত দ্বীনে হানীফসহ প্রেরণ করা হয়েছে।' (বোখারী : ১/১৭৩, মুসলিম : ২/৬০৮)

ঈদের দিনের সুন্নাত ও মুস্তাহাব

(১) মেসওয়াক করা সুন্নাত। (২) গোসল করা সুন্নাত। (৩) সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত। (৪) কিছু খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত। বিজোড় সংখ্যায় যেকোনো মিষ্টিদ্রব্য খাওয়া উত্তম; খেজুর অতি উত্তম। (৫) ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া উত্তম। এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া অন্য রাস্তা দিয়ে আসা মুস্তাহাব। (৬) ঈদগাহে যাওয়ার পথে নিচুস্বরে তাকবীর (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ) পড়া সুন্নত। (৭) সাধ্যমতো উত্তম পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব। (৮) নামাযের জন্য ঈদগাহে যাওয়ার আগে সদকায়ে ফিতর আদায় করা সুন্নাত। (দাতা ও গ্রহীতার সুবিধার্থে রমাজানেও প্রদান করা যায়)। (৯) ঈদের দিন চেহারায় খুশির ভাব প্রকাশ করা ও কারো সঙ্গে দেখা হলে হাসিমুখে কথা বলা মুস্তাহাব। ১০. আনন্দ-অভিবাদন বিনিময় করা মুস্তাহাব। (ফাতাওয়া শামি : ১/৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, হেদায়া : ২/৭১, বোখারী : ১/১৩০, ইবনে মাজাহ : ৯২)।

ঈদের নামায দুই রাক'আত আর তা ওয়াজিব। এতে আযান-ইকামত নেই। যাদের ওপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব তাদের ওপর ঈদের নামাযও ওয়াজিব। ঈদের নামায খোলা ময়দানে পড়া উত্তম। তবে মক্কাবাসীর জন্য মসজিদে হারামে উত্তম। শহরের মসজিদগুলোতেও ঈদের নামায জায়েয আছে। (বোখারী : ১/১৩১, ফাতাওয়া শামি : ১/৫৫৫, ১/৫৫৭, আল মুহাজ্জাব : ১/৩৮৮)।

ঈদের নামাযের সময়

সূর্য উদিত হয়ে এক বর্শা (অর্ধ হাত) পরিমাণ উঁচু হওয়ার পর থেকে শুরু হয়ে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাকি থাকে। তবে ঈদুল ফিতরের নামায একটু দেরিতে পড়া সুন্নাত; যেন নামাযের আগেই বেশি থেকে বেশি সদকাতুল ফিতর আদায় হয়ে যায়। (ফাতহুল কাদির : ২/৭৩, আল মুগনি : ২/১১৭)।

নামাযের নিয়্যাত

নিয়্যাত অর্থ মনের ইচ্ছা। কাজেই মুখে উচ্চারণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। মনে মনে নির্দিষ্ট করতে হবে যে আমি এ ঈদের নামায কিবলামুখী হয়ে এই ইমাম সাহেবের পেছনে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সঙ্গে আদায় করছি। প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরিমা ও 'ছানা'র পর তিন তাকবীর। দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাতের পর রুকুতে যাওয়ার আগে তিন তাকবীর। এ তাকবীরগুলো বলার সময় ইমাম-মুক্তাদী সবাইকে হাত উঠাতে হবে। তৃতীয় তাকবীর ছাড়া প্রত্যেক তাকবীরের পর হাত ছেড়ে দিতে হবে। (ফাতাওয়া শামি : ১/৫৫৯, ৫৬০)।

কারো ঈদের নামাজ ছুটে গেলে শহরের অন্য কোনো জামা'আতে শরীক হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। পরিশেষে যদি নামা ছুটেই যায় তাহলে এর কোনো কাজা নেই। (ফাতাওয়া শামি : ১/৫৬১)।

পরিচিত কারো সঙ্গে কিছুদিন বা অনেক দিন পর দেখা হলে উভয়ে ডান গলা মিলিয়ে মহববতের সঙ্গে একবার কোলাকুলি করা এবং 'আল্লাহুম্মা যিদ্ মহাব্বাতী লিল্লাহী ওয়া রাসূলিহ্' পড়া সুন্নত। তবে ঈদের দিন জরুরি মনে করে কোলাকুলি করা উচিত নয়। (তিরমিযী : ২/১০২, মাহমুদিয়া : ২৮/২১১, ইসলাহী খুতুবাত : ১/১৮৬-১৮৭)

যৌতুক প্রথা : মানবতাবিবর্জিত একটি সামাজিক অভিশাপ

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

বর্তমান বাংলাদেশে যৌতুক একটি সামাজিক মহামারি। সাম্প্রতিককালে এ প্রথা জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। যৌতুক হলো মানবতাহীন লোভীদের গোপন স্লোগান। অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ ও প্রতারণার অমানবিক পদ্ধতি। মানসিক নির্যাতনের অলিখিত পদক্ষেপ। যৌতুক প্রথার কারণে নারীর মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। মানবিক মর্যাদা বিপন্ন হচ্ছে। বহু পরিবারে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে। কত সন্তান এতিম হচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে মা-বাবার পরম স্নেহ থেকে। অসংখ্য মা-বোনের নির্মমভাবে প্রাণহানির নিষ্ঠুর ঘাতক এই অভিশপ্ত যৌতুক প্রথা। যৌতুকের অভিশাপে আত্মহত্যা, বিবাহবিচ্ছেদ, পারিবারিক কলহ আজ নিত্যদিনের খবর। যৌতুক প্রথার কবলে দাম্পত্যজীবন আজ হুমকির সম্মুখীন। এই যৌতুককে কেন্দ্র করে স্বামীর পাশবিক অত্যাচার-নির্যাতনে মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর দিন গুনছে কত অসহায় নারী। যৌতুকলোভী স্বামীর দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়ে কত কত সাজানো পরিবার আজ নির্মমভাবে ধ্বংস হচ্ছে। বিরান হচ্ছে কত ঘর-ভিটা। ম্লান হচ্ছে কত শত আশা, হাজারো স্বপ্ন। যৌতুক কলহে নারীরা আজ স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত। এই কুপ্রথার অভিশাপেই নিরীহ মা-বোনদের স্বপ্ননীড় ভেঙে চুরমার হচ্ছে। মেহেদির রং যাওয়ার আগেই কত নববধূর বাসরঘরে অশান্তির কালো ছায়া নেমে আসে। শত-সহস্র মেয়ের বিয়ের সময় পার হচ্ছে; কিন্তু যৌতুক সংগ্রহে অপারগ বিধায় তাদের বিয়ের কোনো উপায় হচ্ছে না। বিরাজ করছে তাদের জীবনে হতাশার আগুন। বিস্তার করছে তাদের অন্তরে অশান্তির কালো ছায়া। অভিভাবকরা আজ দিশাহারা। যৌতুক নিয়ে সৃষ্ট হানাহানি, আত্মহত্যা ও মামলা-মোকদ্দমা আজ খবরের কাগজে প্রতিদিনের অন্যতম আকর্ষণ।

বিয়ের আগে বা পরে তো বটেই, বিয়ের দীর্ঘদিন পরও যৌতুকের দাবি–এ সমস্যায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ভাবিয়ে তুলছে সমাজের দায়িত্ববান প্রতিটি অভিভাবককে। সমাজের প্রতিটি বিবেকবান মানুষ এ জঘন্য ও মানবতাবিরোধী প্রথার অবসান কামনা করে। যৌতুকের অভিশাপমুক্ত দেশ ও জাতি গঠনে সর্বস্তরের জনগণকে অনুপ্রাণিত করাই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

যৌতুক প্রথার প্রচলিত বিভিন্ন রূপ

আমাদের সমাজে প্রচলিত পরিভাষায় যৌতুক হলো, বরপক্ষ থেকে কন্যাপক্ষের কাছে শর্তারোপ নগদ অর্থ বা কোনো পণ্যসামগ্রী আদায় করা। নগদ অর্থ, জমি, গাড়ি-বাড়ি, অলংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহসামগ্রী, টিভি-ফ্রিজ ইত্যাদি আদায় করা যৌতুকের আওতাভুক্ত। কখনো বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন, প্রাসঙ্গিক খরচ বা ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর সহযোগিতা শিরোনামে কন্যাপক্ষ থেকে টাকা-পয়সা আদায়ের নানামুখী কৌশল অবলম্বন করে থাকে। বস্তুত এসব পদ্ধতি নিষিদ্ধ যৌতুকেরই বিভিন্ন রূপ মাত্র। যৌতুকলোভীরা আজ যৌতুকের নাম পরিবর্তন করে উপহার, সেলামি, পকেট খরচ, নেগোসিয়েশন, ডোনেশন, বিদেশ ভ্রমণ, চাকরি প্রদান ইত্যাদি অভিনব নামে তারা সমাজকে কলুষিত করে যাচ্ছে। কোনো কোনো অঞ্চলে ঋতুভিত্তিক যৌতুক প্রচলিত আছে। মৌসুমি ফল, সবজি, ধান-গম, লেপ-তোষক, নতুন মডেলের গাড়ি, টিভি-ফ্রিজ দাবি করা বা আশা করা আজ ব্যাপক কুপ্রথায় পরিণত হয়েছে। সৃষ্টি হচ্ছে অন্যায়ভাবে নারী নির্যাতনের নতুন নতুন ফাঁদ। রচিত হচ্ছে প্রগতির নামে দুর্গতি। ফলে অশান্তি-অরাজকতা আজ আমাদের জীবনে নিত্যদিনের সঙ্গী। শান্তি নামক কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি আমাদের নাগালের বাইরে। আনন্দ-সুখের নীড় গড়তে আমরা চরমভাবে ব্যর্থ। তার পরও চিরচেনা আদর্শ পথ অবলম্বন থেকে আমরা দূরে, অনেক দূরে।

যৌতুক প্রথার প্রচলন ও বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ

ইসলামপূর্ব অন্ধকার যুগে নারীদের নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করা হতো। ওই সমাজে নারীর ন্যূনতম মর্যাদা ছিল না। তাদের কোনো অধিকার ছিল না। অঢেল সম্পদের বিনিময়ে তাদের বিয়ে দিতে হতো। আর এ বিনিময় প্রথাই হচ্ছে অভিশপ্ত যৌতুক। মানবতার ধর্ম ইসলাম সেই ঘৃণ্য যৌতুক প্রথার মূলোৎপাটন করেছে। প্রতিষ্ঠা করেছে

নারীর সর্বোচ্চ মান-মর্যাদা ও অধিকার। নিশ্চিত করেছে মা-বাবার সম্পদে মেয়েদের উত্তরাধিকার অংশ। একসময়ে হিন্দু সমাজে পিতার সম্পদে কন্যার অধিকার স্বীকৃত ছিল না। তাই বিয়ের সময় কন্যাকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সাধ্যানুযায়ী দিতে হতো, যা পর্যায়ক্রমে যৌতুক প্রথায় পরিণত হয়। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বসবাসের ফলে মুসলিম সমাজে এ কুপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে। অথচ ইসলাম দেড় হাজার বছর আগেই যৌতুক প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেছে। মেয়ে-ছেলে সবার জন্য মা-বাবার সম্পদে উত্তরাধিকার প্রদানের মাধ্যমে নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন করেছে। উচ্চমর্যাদার আসনে নারীদের স্থান দিয়েছে।

যৌতুক প্রথা ও ইসলাম

ন্যায়-নীতি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম। এ ধর্মে অন্যায় নেই, প্রবণতা নেই, উগ্রতা নেই। নেই জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন। আত্মসাৎ, প্রতারণাও অনধিকার চর্চা এ ধর্মে নেই। নেই যৌতুকের মতো অমানবিক প্রথা ও অন্যায় দাবিদাওয়ার কোনো ভিত্তি। ইসলাম সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও উদারতার শিক্ষা দেয়। ঐক্য, সোহাগ-সম্প্রীতি আর অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার বার্তা নিয়েই এ ধর্মের শুভ যাত্রা। পরম মানবতা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়েই এর আগমন। তাই যৌতুক বিষয়ে ইসলামের সমাধান খুবই স্বচ্ছ ও নির্মল। ইসলামের আলোকে বিবাহ হলো দ্বিপক্ষীয় চুক্তি। এতে স্বেচ্ছায় খুশি হয়ে, নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উপহার আদান-প্রদান করতে পারে। প্রিয় নবী (সা.) তাঁর মেয়ে ফাতেমা (রা.)-এর বিয়েতে মেয়ের সংসারের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী দিয়েছিলেন। (ইবনে মাজাহ : হা. ৪১৫২, নাসায়ী : হা. ৩৩৮৪, মুসতাদরাক : হা. ২৭৫৫ সহীহ)। তবে কন্যাপক্ষকে দিতে বাধ্য করা, চাপ সৃষ্টি করা বা পরিস্থিতি তৈরি করা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও অবৈধ। মহানবী (সা.) বলেন, কোনো মুসলমানের মাল-সম্পদ তার পূর্ণ সন্তুষ্টি ব্যতীত বৈধ হবে না। (বায়হাকী সুনান : হা. ১০৬৬১, দারাকুতনী : হা. ২৫৩১)। মহানবী (সা.) বলেন, "কোনো মুসলমানের জন্য অপরজনের জানমালের ক্ষতি সাধন ও মর্যাদাহানি করা হারাম।" (সহীহ মুসলিম : হা. ২৫৬৫, তিরমিযী : হা. ১৯২৭)

মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না।" (নিসা : ২৯)

সাহাবী উমর (রা.) বলেন, "হে মুসলমান সম্প্রদায়! তোমরা বিয়েতে মোটা অংকের মোহর, আড়ম্বরতা ও যৌতুক দাবি করো না। কেননা আল্লাহর কাছে এর কোনো মূল্য নেই।" (তিরমিযী : হা. ১১১৪ হাসান সহীহ)

ইসলামের আলোকে নারী ও পুরুষ পারিবারিক জীবনে পরস্পরের সহযোগী, সহমর্মী ও সমমর্যাদার অধিকারী। বৈবাহিক জীবনকে ইসলাম এক মহিমান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। কোরআন-হাদীসের নির্দেশনা মতে দাম্পত্যজীবন হচ্ছে ভালোবাসার সেতুবন্ধন। বিরাগ বিরহ ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ এবং কোনো ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়, এমন আবদার এ বন্ধনে ফাটল সৃষ্টি করার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "আল্লাহর নির্দেশাবলির মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছে, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।" (রূম : ২১)

অন্য আয়াতে বলেন, "নারীগণ হলো তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা হলে নারীদের ভূষণ।" (বাকারা : ১৮৭)

আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা কত যে বাস্তব। বিবাহের মাধ্যমে অপরিচিত দুজনের মধ্যে সত্যিই অকৃত্রিম ভালোবাসা গড়ে ওঠে। আন্তরিকতার বন্ধনে আবদ্ধ হয় দুটি ভিন্ন পরিবার। কিন্তু যৌতুক প্রথার মতো এক বিষাক্ত ব্যাধি আমাদের চিরায়ত সুশৃঙ্খল পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এগিয়ে দিচ্ছে বিপৎসীমার ওপারে।

যৌতুকের প্রতিকার

যৌতুক প্রথার শিকড় সমাজের গভীরে প্রোথিত। এই বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলার জন্য, একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের জন্য, যৌতুকের অভিশাপ থেকে সমাজ দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। যৌতুকবিষয়ক প্রচলিত আইন ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

যৌতুকের বিরুদ্ধে আমাদের লেখা, বক্তৃতা ও আচার-আচরণে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। যৌতুকের কুফল, ভয়াবহ গ্লানি এবং অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সর্বস্তরের নারী-পুরুষকে অবহিত করতে হবে। পৌঁছে দিতে হবে সবার কাছে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় ইসলামের অবদান, চির শান্তি ও মুক্তির বিধান, ঐক্য, সোহাগ-সম্প্রীতি ও মানবতার পথ ও পাথেয়।

মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৫

মুফতী শরীফুল আজম

আমীর না শুরা

হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তা'আলা প্রতি শতাব্দীতে এই উম্মতের মাঝে এমন একজন মনীষী প্রেরণ করেন, যিনি দ্বীনের সংস্কার করেন। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) ছিলেন এমনই একজন সংস্কারক, যাঁকে মুজাদ্দিদ বলা হয়। এ কথার স্বীকৃতি সমকালীন ওলামা-মাশায়েখের মন্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে। হযরতজি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁর এই সংস্কারমূলক কাজ দেখে মন্তব্য করেছিলেন,

الیاس نے یاس کو اس سے بدل دیا

অর্থ : ইলিয়াছ হতাশার মাঝে আশার সঞ্চার করেছেন।

হযরত মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর এলাহাবাদের জেলে বন্দি থাকাবস্থায় এক শোক বার্তায় লিখেছেন,

اگرچہ ہمارے لیے اسلاف کرام نے منہاج قدیم پہلے سے مشعل کے طور پر مہیا کر دیا تھا، مگر مرحوم نے اس کی تجدید اور بہترین تجدید کر دی ہے، ہماری جد وجہد اور ہمارا نصب العین ہونا چاہئے (سوانح مولانا محمد انعام الحسن ۱/۷۱)

অর্থ : যদিও আমাদের জন্য আকাবীর আসলাফগণ পুরাতন কর্মপন্থা স্পষ্টভাবে বাতলে দিয়ে গেছেন, কিন্তু মরহুম মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) এর সংস্কার এবং উত্তম সংস্কার করে দিয়েছেন। আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এই মেহনতের মাঝে নিবদ্ধ হওয়া চাই। (সাওয়ানেহ-১/৭১)

অতএব বোঝা গেল, সমকালীন ওলামা-মাশায়েখগণ তাঁকে দাওয়াতের চলমান মেহনতের সংস্কারক হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এ হিসেবে তিনি এই মেহনতের শুধু আমীরই নন বরং মুজাদ্দিদও বটে।

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাঝে বর্তমান সময়ে আমীর না শুরা এই নিয়ে যে সংকট ঘনীভূত হয়েছে, তা নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে তিনবার এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে মুবারক এই মেহনত। আর প্রতিবারই ওলামা-মাশায়েখের দিকনির্দেশনা ও সুচিন্তিত পরামর্শের মাধ্যমে সমাধানের পথ বের হয়ে এসেছে।

[১]

প্রথমবার যখন হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) অন্তিম অবস্থায় উপনীত হন তখন তার পরবর্তীতে এ কাজের হাল কে ধরবে, তা নিয়ে শুরু হয় জল্পনা-কল্পনা। অথচ তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা ইউসুফ কান্দলভীর এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। বাবার উত্তরসূরি হিসেবে নিজে আমীর হবেন–এমন কোনো বিষয় তাঁর কাছ থেকে প্রকাশ হয়নি। তিনি বড়মাপের আলেম ছিলেন, ইলমী ব্যস্ততার মাঝেই তাঁর সময় কাটত। দাওয়াতের কাজের প্রতিও তাঁর খুব একটা আগ্রহ প্রাথমিক অবস্থায় ছিল না। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) একবার মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী সাহেবকে বললেন, মুফতী সাহেব! ইউসুফকে এই কাজের প্রতি মনোযোগী করার জন্য আপনি একটু চেষ্টা করেন।

ভবিষ্যতে যে এই ব্যক্তির ওপরই আলমী এই মেহনতের জিম্মাদারি অর্পিত হতে যাচ্ছে, তা কারো চিন্তায় আসেনি। কিন্তু কিভাবে তা হলো এর বিবরণ শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর এক ডায়েরি থেকে জানা যায়। তিনি লিখেন, চাচাজান মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-এর দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে হযরত আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.) কয়েকবার নিজামুদ্দিন আগমন করেন। একবার আমাকে বলেন, মাওলানা ইউসুফকে জিকির-আযকারে মনোযোগী হতে বলেন। অথচ তিনি সদা ইলমী ব্যস্ততার মাঝে ডুবে থাকতেন। সর্বশেষ হযরত রায়পুরী (রহ.) হযরতজির ইন্তেকালের ১০ দিন পূর্বে নিজামুদ্দিন আসেন। ওই সময় তিনি আমাকে বলেন, হযরতজিকে বলে মাওলানা ইউসুফকে ইযাজত তথা খিলাফত নিয়ে দাও। আমি বললাম, এখনো তো সে তেমন কোনো মেহনত করেনি। তিনি বললেন, কোনো অসুবিধা নেই। আপনাদের অনেক কিছুর শুরু আর আমাদের শেষ। এরপর তিনি নিজেও চাচাজানের কাছে গিয়ে এ কথা বলেন। চাচাজানের ইন্তেকাল হয় ২১ রজব ১৩৬৩ হিজরী। এর দুই দিন পূর্বে তিনি বলেন, আমার লোকদের মাঝে এই কয়জন খিলাফত পাওয়ার উপযুক্ত। (১) হাফেজ মকবুল হাসান সাহেব (রহ.), (২) ক্বারী দাউদ সাহেব (রহ.), (৩) মাওলানা এহতেশামুল হাসান কান্দলভী (রহ.), (৪) মাওলানা ইউসুফ কান্দলভী (রহ.), (৫) মাওলানা এনামুল হাসান কান্দলভী (রহ.), (৬) মাওলানা সৈয়দ রেজা হাসান সাহেব (রহ.)।

তুমি এবং হযরত রায়পুরী মশওয়ারা

করে এদের মধ্য থেকে যাকে বাছাই করবে আমার সামনেই তার হাতে লোকদের বাইয়াত করিয়ে দাও।

পরের দিন ২০ রজব ১৩৬৩ হিজরী মাওলানা এহতেশামুল হাসানের কামরায় মশওয়ারা শুরু হয়। হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.), শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.), মাওলানা জাফর আহমদ থানভী (রহ.)সহ অন্যান্যরা মশওয়ারায় উপস্থিত; কিন্তু সেখানে নেই শুধু মাওলানা ইউসুফ (রহ.)। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতার পাশে বসে আছেন। এমতাবস্থায় সর্বশেষ পিতা-পুত্রের কিছু কথোপকথন হয়।

মাওলানা ইউসুফ (রহ.) বলেন, বুধবার দুপুর ৪টার দিকে হযরতজি (রহ.)-এর ডান পাশে বসা ছিলাম, তিনি আওয়াজ দিলেন! আমি উঠে বাম দিকে এসে চেহারা মুবারকের কাছে বসলাম। তিনি বললেন, হযরতগণ কোথায়? আমি বললাম, মাওলানা এহতেশাম সাহেবের রুমে মশওয়ারা করছেন। বললেন, তুমি ওই মশওয়ারায় শরীক হওনি? আমি বললাম, যদি আপনি অনুমতি দেন তবে গিয়ে বসব। বললেন, তোমার বিষয়েই তো মশওয়ারা আর তুমি সেখানে নেই। ঠিক আছে, ডাকলে চলে যেও।

মশওয়ারা শেষে তাঁরা হযরতজির কাছে এসে বললেন, আমাদের পরামর্শ হলো আপনি সর্বপ্রথম মাওলানা ইউসুফ সাল্লামাহুকে খিলাফত দিয়ে দিন। আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর মাঝে খিলাফতের সকল শর্ত বিদ্যমান। তিনি ভালো আলেম, আমলদার, পরহেজগার। বাকি ওজীফা তিনি পুরা করে নেবেন।

উল্লেখ্য যে মাওলানা ইউসুফ (রহ.) তাঁর পিতা মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে পাসে আনফাসের যিকির পর্যন্ত সবক দীর্ঘদিন থেকে আদায় করছিলেন।

অতএব ওলামা-মাশায়েখের এই ফয়সালা হযরতজি (রহ.) মেনে নিয়ে বললেন–হ্যাঁ, আপনাদের তিনজনের রায় অত্যন্ত মুবারক। এরপর তিনি দু'আ করে দেন–হে আল্লাহ! এই তিনজন যে ফয়সালা করেছে তাতে আপনি বরকত দান করুন। এর মাঝে আমাদের কোনো ত্রুটি হলে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে এখলাস দান করুন। এরপর ওই দিন এলান করে মাওলানা ইউসুফ (রহ.) হতে হযরতজির সম্মুখে বাইয়াত গ্রহণ আরম্ভ করে দেওয়া হয়।

এভাবে প্রথম হযরতজির ইন্তেকালের এক দিন পূর্বে ওলামা-মাশায়েখের পরামর্শক্রমে দ্বিতীয় হযরতজি হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহ.) আমীর নিযুক্ত হলেন। এখানে তাঁর পক্ষ থেকে আমীর হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ পায়নি।

[২]

দ্বিতীয়বার আমীর নিযুক্তির বিষয় আলোচনায় আসে হযরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর। ১৯ জিলকদ ১৩৮৪ হিজরী মোতাবেক ২ এপ্রিল ১৯৬৫ ইং হযরতজি (রহ.) পাকিস্তানের রায়বেন্ড মারকাযে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে গাড়িতেই ইন্তেকাল করেন। ওই সফরে মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) হযরতজির সাথেই ছিলেন। হযরতজির সর্বদা নির্দেশ ছিল যে স্থানে মৃত্যু হবে, সেখানেই যেন তাঁকে দাফন করা হয়। তাই মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) লাহোরেই দাফন করার পক্ষে মত দেন। কিন্তু দাফনের বিষয় নিয়ে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। কেউ নিজামুদ্দিন ফিরিয়ে আনার পক্ষে। কেউ হযরতজির (রহ.) নির্দেশ মতে লাহোরেই দাফন করার পক্ষে। অবশেষে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) সিদ্ধান্ত দেন যে সহজে নিজামুদ্দিন আনা সম্ভব হলে নিয়ে আসা হোক, অন্যথায় রায়বেন্ড মারকাযে দাফন করা হোক। অতঃপর নিজামুদ্দিন আনার চেষ্টা সফল হয়।

জানাযা ও দাফনের পর হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) যিনি স্বীয় চাচাজান মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-এর যুগ থেকে তাবলীগের কাজে উপদেষ্টার ভূমিকা রেখে আসছেন। যিনি মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-কে আমীর নিযুক্ত করার পরামর্শেও উপস্থিত ছিলেন। এবার তাঁরই উদ্যোগে দাওয়াত ও তাবলীগের তৃতীয় আমীর নিযুক্তির পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর পর কে এই বিশ্ব তাবলীগের হাল ধরতে পারেন–এই নিয়ে ইতিমধ্যে ব্যাপক গুঞ্জন আর জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যায়। কারো মতে, হযরতজির ছেলে মাওলানা হারুন সাহেব তাঁর বাবা এবং দাদার উত্তরসূরি হিসেবে আমীর হওয়ার বেশি হকদার। আর কারো মতে, এই মেহনতে সর্বদা হযরতজির সঙ্গী এবং মেহনতের বুঝ রাখেন মাওলানা এনামুল হক। যিনি হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) থেকে খিলাফতও পেয়েছেন। তাই আমীর হিসেবে উপযুক্ত তিনিই।

এমনই এক পরিস্থিতিতে ওলামা-মাশায়েখ পরামর্শে বসেন। নিজামুদ্দিনে তখন উপস্থিত ছিলেন শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.), ফেদায়ে মিল্লাত সাইয়্যেদ আসআদ মাদানী (রহ.), মাওলানা উমর পালনপুরী (রহ.), মাওলানা ফখরুল হাসান (রহ.) প্রমুখ দেওবন্দ ও সাহারানপুরের শীর্ষ ওলামা-মাশায়েখ। পরামর্শক্রমে মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-কে আমীর নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়।

নিজামুদ্দিন মারকাযে জানাযার উদ্দেশ্যে আগত সারা দেশের পুরাতন সাথি এবং উলামায়ে কেরামের বিশাল এক মজমা উপস্থিত ছিল। সকলের মাঝে এলান করে দেওয়া হয় যে মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব যিনি মরহুম হযরতজির সর্বদা সঙ্গী ছিলেন, এখন থেকে তিনি আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর এই ফয়সালা সাহেবজাদা মাওলানা হারুন সাহেবের সমর্থকদের মাঝে অনেকে মেনে নিতে পারেনি। তারা এর প্রতিবাদ করে। অনেকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য শায়খের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু শায়খ (রহ.) তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। মাওলানা হারুন (রহ.)-এর পক্ষ থেকেও তাঁর সমর্থকরা কোনোরূপ আস্কারা পায়নি বরং তিনি নিজে শায়খের ফয়সালা মেনে নিয়ে সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকেন। ফলে ওই ফেতনা আর বেশি দূর এগোতে পারেনি।

সাহেবজাদার ভূমিকা :

তৃতীয় হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর সর্বপ্রথম বাইয়াতের যে মজলিস অনুষ্ঠিত হয় তাতে অগণিত মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাইয়াতের পূর্বে সাহেবজাদা মাওলানা হারুন (রহ.) সংক্ষিপ্ত এক বক্তৃতার মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় আববাজানের পর আমাদের রাহবারী করার জন্য হযরত মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব নির্ধারিত হয়েছেন। যাঁরা আব্বাজানের সাথে বাইয়াতের সম্পর্ক রাখতেন তাঁরা মাওলানার হাতে বাইয়াত নবায়ন করে নিন। যেভাবে তাঁর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রাখতেন, এখন তা মাওলানার সাথে রাখবেন। আমাদের রাহবারী ও ইসলাহের জন্য হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) যেভাবে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব (রহ.)-কে নির্বাচন করেছিলেন, ঠিক একই পদ্ধতিতে হযরত মাওলানা এনামুল হাসান সাহেবকেও আদেশ দিয়েছিলেন। আপনারা হযরতের উপস্থিতিকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য ও গনিমত মনে করে তাঁর হাতেই বাইয়াত হয়ে যান।

এই ছিল তখনকার সাহেবজাদা মাওলানা হারুন (রহ.)-এর বিনয়ের পরিচয়। তাঁদের এখলাছের বরকতেই দাওয়াতের এই মেহনত সারা বিশ্বের জন্য কবুল হয়েছে। নিজে আমীর হওয়ার দাবি করা তো দূরের কথা, সমর্থকদের উস্কানি বা অতিউৎসাহী মনোভাবও তাঁর অন্তরে আমীর হওয়ার বাসনা জাগ্রত করতে পারেনি। উল্টো সমর্থকদের বুঝিয়ে ফেতনা দমনে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। এমন বিনয় আর এখলাছের পরিচয় দিতে না পারলে হয়তো বড় ফেতনার সম্মুখীন হতো মুবারক এই মেহনত।

হযরত শায়খের অভিব্যক্তি :

এসংক্রান্ত এক পত্রে শায়খুল হাদীস (রহ.) তৎকালীন পরিস্থিতি ব্যক্ত করে লিখেন, চাচাজানের পর প্রিয় ইউসুফ মরহুমের আমীর নির্বাচন চাচাজানের জীবদ্দশাতেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অথচ এ বিষয়ে অনেকেই আমাকে দোষারোপ করেছে। আর প্রিয় ইউসুফের ইন্তেকালের পর মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর আমার ওপর যে চাপ এসেছে, তা অবর্ণনীয়। বিভিন্ন চিঠিপত্র, লিফলেট এবং প্রতিনিধিদল এসেছে। সবার একটাই কথা–তুমি হারুনের ওপর বড় জুলুম করেছ। ইমাম সাহেব ফতেহপুরী মরহুম তিনবার করে দলবল নিয়ে এসেছে চাপ প্রয়োগ করেছেন যে তোমার এ সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করে দেখো। আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে এটা খানকার গদি নয়, আমার দৃষ্টিতে এখানে মাওলানা এনাম বেশি যোগ্য। এ বিষয়ে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে মাওলানা হারুনের কৃতজ্ঞতা আদায় করি। আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করুন এবং নিজের খাস নৈকট্য দান করুন। তাকে পাগলের দল খুব উস্কানি দিয়েছে, কিন্তু সে প্রত্যেককে বলে দিয়েছে যে শায়খ যে ফয়সালা করে দিয়েছেন সেটাই হক। সে এ ব্যাপারে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। যদি সে ওই আহমকদের উস্কানির শিকার হয়ে যেত তাহলে সব উলটপালট হয়ে যেত। (পত্রটি লেখা হয় মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস সাহেবের নামে ২৩ নভেম্বর ১৯৭৫ ইং)

মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-এর বিনয় :

তাবলীগের তৃতীয় বিশ্ব আমীর হিসেবে মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন তৎকালীন সাহারানপুর ও দেওবন্দের ওলামা-মাশায়েখগণ। নিজের পক্ষ থেকে আমীর দাবি করা বা তদবির করা কিংবা আশা করা কোনোটাই মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) থেকে প্রকাশ পায়নি। বরং তিনি এমন বিনয়ী ছিলেন যে তাঁর মতো ব্যক্তির তাবলীগে কোনো প্রয়োজন নেই বলে মনে করতেন। আর নিজেকে গোপন করার কামনা-বাসনা অন্তরে ধারণ করতেন।

বিশ্ব আমীর নিযুক্ত হওয়ার মাত্র বারো দিন আগের একটি ঘটনা। যে সফরে হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) ইন্তেকাল করেন ওই সফরে মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে রায়বেন্ড উপস্থিত ছিলেন। এক মজলিসে মাওলানা জামিল আহমদ

হায়দারাবাদী মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-কে বললেন যে, হযরত কাজ তো আলহামদুল্লিাহ দিন দিন বেড়েই চলছে। এমতাবস্থায় মুম্বাই-হায়দারাবাদের মতো দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরের মারকাযে পুরাতন সাথিদের দাওরের জামাআত বাংলাওয়ালী মসজিদের হযরতদের সাথে নিয়ে সফর করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যাতে কাজের জায়েযা নেওয়া যায় এবং সর্বত্র একই পদ্ধতি অনুসরণ কিভাবে হতে পারে এবং পুরাতন সাথিদের সিফাত কী হওয়া চাই এর ওপর আলোচনা পেশ করা যায়। মাওলানা ইউসুফ সাহেব তো সীমাহীন ব্যস্ততার কারণে এমন দাউর করতে পারবেন না। তবে আপনার সাথে যদি একটি জামাআত এই দাউর করে তবে আমরাও সাথে থাকব অনেক ফায়দা হবে। এ কথা শুনে মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) যে মন্তব্য করলেন তাতে তাঁর উচ্চপর্যায়ের বিনয় প্রকাশ হয়ে যায়। তিনি বলেন,

بھائی جمیل! تم نے تو بہت آگے کی بات کہہ دی ، میں تو اپنے بارے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ بنگلہ والی مسجد اور مولانا محمد یوسف صاحب کے ساتھ سفروں میں میرا مصرف کیا ہے؟ کبھی کبھی طبیعت پر شدت سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ خاموشی سے کہیں روپوش ہوجاوں کہ کسی کو میرا پتہ نہ چل سکے لیکن پھر مولوی صاحب (مولانا یوسف صاحب) کا خیال آتا ہے کہ کہیں کہ برسوں کی رفاقت تھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، بس یہ سوچ کر رک جاتا ہوں (سوانح مولانا انعام الحسن ۱/۲۸۱)

ভাই জামিল! আপনি তো বহুত দূরের কথা বলে ফেললেন। আমি তো নিজের ব্যাপারে সব সময় চিন্তা করি যে বাংলাওয়ালী মসজিদ এবং মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সাথে সফরে আমার কী কাজ? কখনো কখনো খুব মনে চায় চুপ করে কোথাও আত্মগোপনে চলে যাই। যাতে কেউ আমার সন্ধান না পায়। কিন্তু পরক্ষণেই মাওলানা ইউসুফ সাহেবের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি হয়তো বলবেন, বহু বছর একসাথে চললেন আর এখন আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। ব্যস, এ কথা চিন্তা করে থেমে যাই। (সা. মাও. এ. ১/২৮১)

এই ছিল মাওলানা এনামুল হাসান সাহেবের বিনয়ের পরিচয়। তিনি নিজেকে কিছুই মনে করতেন না। এই মেহনতের জন্য তাঁর কোনো প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন না। নিজেকে এত ছোট মনে করতেন, অথচ এ ঘটনার বারো দিন পর তিনিই এই কাজের উপযুক্ত আমীর হিসেবে সকলের কাছে প্রকাশ পান। কোথাও পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে গোটা বিশ্বের জিম্মাদারি নিজ স্কন্দে তুলে নিতে বাধ্য হন। এটাকেই বলে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

উল্লেখ্য, মাওলানা ইউসুফ (রহ.) এবং মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) সম্পর্কে চাচা-ভাতিজা ছিলেন। মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে হলেন মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)। বয়সে মাওলানা ইউসুফ (রহ.) মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) থেকে এক বছরের বড় ছিলেন। লেখাপড়ার যামানায় দুজন এক জামাতেই সহপাঠী ছিলেন, উভয়ের বিয়েশাদি এক মজলিসেই অনুষ্ঠিত হয়। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর দুই কন্যার সাথে দুজনের বিয়ে হয়। বিয়ে পড়ান হযরত আকদাস মাদানী (রহ.)। উভয়ে একসাথে হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-এর হাতে বাইয়াত হন। অতঃপর উভয়ে তাঁর কাছ থেকে খিলাফত ও এজাযত পান।

[৩]

তৃতীয়বার আমীর নিযুক্তির আলোচনা আসে হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর। ইতিপূর্বে তিনি দাওয়াতের মেহনত ব্যাপক আকার ধারণ করায় এর পরিচালনার জন্য একটি শুরা গঠন করেছিলেন। যার সদস্য ছিলেন–

১. মাওলানা সাঈদ আহমদ খান (রহ.)
২. মুফতী যাইনুল আবেদিন (রহ.)
৩. হাজী মোহাম্মদ আফজাল (রহ.)
৪. হাজী আব্দুল মুকিত (রহ.)
৫. হাজী আব্দুল ওয়াহ্হাব দা.বা.
৬. মাওলানা ইযহারুল হাসান (রহ.)
৭. মাওলানা মোহাম্মদ উমর পালনপুরী (রহ.)
৮. মাওলানা যুবাইরুল হাসান (রহ.)
৯. মিয়াজি মেহরাব (রহ.)
১০. মাওলানা মোহাম্মদ সা'দ দা.বা.

তৃতীয় হযরতজির ইন্তেকালের পর তাঁর বানানো শুরা কমিটি এক পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। পরবর্তী আমীর কে হবেন এ নিয়ে পরামর্শ শুরু হয়। মাওলানা সা'দ সাহেব তখন বলেছিলেন, যদি মাওলানা যুবাইরুল হাসানকে আমীর মনোনীত করেন তাহলে আমার সাথে যারা সম্পর্ক রাখে ওই সকল সাথী মেহনত থেকে সরে যাবে। আর যদি আমাকে আমীর বানান তাহলে যারা যুবায়রুল হাসানের সাথে সম্পর্ক রাখে তারা মেহনত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে। কাজেই আমি মনে করি, এখানে কোনো আমীর না থাক। মেহনত শুরার অধীনে পরিচালিত হবে, আর নিজামুদ্দিনে কোনো ধরনের বাইয়াত হবে না। মাওলানা সা'দ সাহেব পরামর্শ মতে সেদিন গুরুত্বপূর্ণ দুটি ফয়সালা হয়। (ক) একক আমীরের পরিবর্তে শুরার মাধ্যমে দাওয়াতের মেহনত পরিচালিত হবে। (খ) বাংলাওয়ালী মসজিদে বাইয়াতের

সিলসিলাহ বন্ধ থাকবে।

এটা ছিল ১২ জুন ১৯৯৫ ইং তারিখের ঐতিহাসিক মশওয়ারার সিদ্ধান্ত। সেই মতে দাওয়াতের মেহনত চলতে থাকে। এখন আমীরের পরিবর্তে শুরার মাধ্যমে কাজ হতে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে আমীর এবং শুরা উভয় পদ্ধতি বৈধ। যদি তা যথাযথ নিয়ম পালন করে নির্ধারণ করা হয়। এর দায়িত্ব বর্তায় সমকালীন ওলামা-মাশায়েখ ও আহলে হল্ল ওয়া আকদের জিম্মায়। অতএব দাওয়াতের মেহনতের মাঝে শুরু থেকেই এই নিয়ম অনুসারে আমীর মনোনীত হয়েছে এবং সর্বশেষ শুরা মনোনীত হয়েছে, এ নিয়ে তখন কোনো বিবাদ হয়নি। সকলের মাঝে এখলাস ও লিল্লাহিয়াত ছিল, কেহ পদ-পদবি দখলের চিন্তায় কাজ করেনি বলে ফেতনা থেকে নিরাপদ থেকেছে এই মেহনত।

ফেতনার সূচনা :

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে পরবর্তীতে এই এখলাসের মাঝে ত্রুটি দেখা যায়। ফলে দাওয়াতের মেহনতের মাঝে পূর্বের ন্যায় রহমত-বরকত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ঐক্যের পরিবর্তে এখন ফাটলের সূর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দশজন শুরার মাঝে পাঁচজন ছিলেন নিজামুদ্দিনের। তিন বছরের মাথায় পাঁচের সংখ্যা দুজনে নেমে আসে। মাওলানা সা'দ সাহেব ও যুবায়রুল হাসান (রহ.) বাদে বাকিরা এই তিন বছরের মধ্যে ইন্তেকাল করেন। তাঁদের শূন্যপদে শুরার সদস্য সংখ্যা পূরণ করা হয়নি, দুজন দিয়ে নিজামুদ্দিন চলতে থাকে। আর রায়বেন্ডে থাকেন হাজী আব্দুল ওয়াহ্হাব সাহেব দা.বা.।

মাওলানা যুবায়রুল হাসান (রহ.) একবার এ বিষয়ে মাওলানা সা'দ সাহেবের সাথে কথা বললেন কিভাবে শুরার শূন্য পদগুলো পূরণ করা যায়। এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মাওলানা সা'দ সাহেব প্রস্তাবটি এই বলে নাকচ করে দেন যে সবাই তোমার ও আমার কারণে এখানে জমায়েত হয়, কাজেই অন্য কাউকে বিনা কারণে গুরুত্ব দেওয়ার কী দরকার। তাঁর এ উত্তরে মাওলানা যুবায়রুল হাসান (রহ.) চুপ হয়ে যান, বিবাদে জড়াতে চাননি। উদ্দেশ্য হলো, কোনোভাবেই যেন এই মুবারক মেহনত বিশৃঙ্খলার শিকার না হয়। (মাওলানা আমানতুল্লাহ রুকন মজলিসে আমেলা মাদরাসা কাশেফুল উলুম নিজামুদ্দিন)

হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর যেখানে মাওলানা সা'দ সাহেব নিজেই শুরার পক্ষে মত দিয়ে আমীর প্রথার বিলুপ্তি ঘটান। সেই তিনিই এখন শুরার মাঝে সদস্য নিতে রাজি হচ্ছেন না। এটা তাঁর জীবনের এক রহস্যময় অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। কেন যে তিনি এভাবে বদলে গেলেন তা বোধগম্য নয়। এর কিছুদিন পর মাওলানা যুবায়রুল হাসান (রহ.)-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। ফলে নিজামুদ্দিনে শুরার একমাত্র সদস্য হিসেবে বাকি থাকেন মাওলানা সা'দ সাহেব। শুরা পুনর্গঠনের দাবি ও প্রয়োজনীয়তা এবার জোরদারভাবে দেখা দেয়, কিন্তু ব্যতিক্রম মত পোষণ করতে থাকেন মাওলানা সা'দ সাহেব। শুরা গঠনে তাঁর অনীহা স্পষ্ট হতে থাকে। এ নিয়ে নিজামুদ্দিনে চরম অস্থিরতা বিরাজ করে। যার প্রভাব থেকে বিশ্বময় পরিচালিত এই মেহনত মুক্ত থাকতে পারেনি। পরিস্থিতি অবনতির দিকে যেতে থাকে। ঘটতে থাকে অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন ঘটনা। এরপর ২০১৫ সালের আগস্ট মাসের ১৮ তারিখে মারকাযের ওপরতলার ইউপি তাবলীগের জোড় অনুষ্ঠিত হয়। সেই জোড়ের সমাপনী দিনে মাওলানা যুহাইরুল হাসান সাহেবকে দিয়ে যেন মুসাফাহা না করানো হয়। এ দাবি নিয়ে সাহেবজাদা সাল্লামাহুর অনুগত সমর্থকরা প্রচণ্ড শোরগোল, ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতি বাধিয়ে দেয়। এই লজ্জাস্কর ঘটনার সংবাদ পুরো নগরীতে ছড়িয়ে পড়ে, চারপাশে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। ২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার মারকাযের মাঝেই দিল্লির যিম্মাদারগণদের পরস্পরে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। ২৩ আগস্ট বসতি নিজামুদ্দিনে অবস্থানকারী কিছু সাথি এই মেহনতের সঙ্গে যাঁদের পুরনো সম্পর্ক তাঁরা দুঃখজনক পরিস্থিতির ওপর নিজেদের আফসোস প্রকাশ করতে এবং এর সমাধান বের করার আবেদন নিয়ে মারকাযের যিম্মাদারদের সামনে মশওয়ারার সময় উপস্থিত হন। তাঁদের একজন যখন এ বিষয়ে কথা বলা শুরু করেন তখন সাহেবজাদা সাল্লামাহু তৎক্ষণাৎ ধমকি দিয়ে বলে ওঠেন,

بغیر اجازت آ گئے اور بلا وجہ مداخلت کرتے ہیں، چپ رہیں۔

'অনুমতি না নিয়েই চলে এসেছো! এবং অকারণে নাক গলাচ্ছো! চুপ থাকো' এ নিয়ে যখন পুনরায় উত্তপ্ত কথা-কাটাকাটি শুরু হয়ে যায় তখন সাহেবজাদা সাল্লামাহু বলে ওঠেন,

میں امیر ہوں، خدا کی قسم میں پوری امت کا امیر ہوں۔

"আমি আমীর! আল্লাহর কসম, আমি পুরো উম্মাহর আমীর।" উত্তরে একজন বলে বসেন,

آپ کو امیر کس نے بنایا؟

কে আপনাকে আমীর বানিয়েছে? তখন তিনি চুপ হয়ে যান। এই সময় একজন বলে ওঠেন,

ہم آپ کو امیر نہیں مانتے

"আমরা আপনাকে আমীর মানি না।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন,

تم سب جاؤ جہنم میں۔

"তোমরা সবাই জাহান্নামে যাও।" এ উত্তর পেয়ে তাঁরা উঠে চলে যান।

যখন পরিস্থিতির আশু উত্তরণের কোনো পথ দেখা যাচ্ছিল না তখন তাঁদের মধ্য হতে কিছু সদস্য প্রতিবেশী দেশে অনুষ্ঠিতব্য ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে সেখানকার যিম্মাদারদের পতনোম্মুখ পরিস্থিতির লাগাম টেনে ধরার ব্যাপারে উদ্যোগী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই মতে নভেম্বর ২০১৫ সালের ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের যিম্মাদারদের সামনে পুরো পরিস্থিতি মেলে ধরেন। সেই বৈঠকে সার্বিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে হযরতজি মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব (রহ.)-এর বানিয়ে দেওয়া শুরা পুনর্গঠন করা হবে। (যার দশ সদস্যের মধ্যে হতে আট সদস্য ইতিমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন) সাহেবজাদা সাল্লামাহু উভয় প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি নিজামুদ্দিন মারকাযের শুরার ব্যাপারে বলেন, সেখানে শুরা বিদ্যমান রয়েছে। যখন তাঁর কাছে শুরার বিবরণ তলব করা হয় তখন বলেন, এখন গিয়ে বানিয়ে নেব।

ওই মজলিসেই যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি পুরো উম্মাহর আমীর হওয়ার দাবি করেছেন? তখন প্রথমে পরিষ্কার অস্বীকার করেন। যখন তাঁকে বলা হয় যে সেই বক্তব্যের অডিও রেকর্ড হাতে রয়েছে। তখন তিনি বলেন, যখন কিছু লোক আমার ওপর চড়ে বসবে, আর মশওয়ারার মাঝে হট্টগোল বাধবে তখন কি আমি কিছু বলতে পারব না?

সাহেবজাদা সাল্লামাহুর এই দ্বিমুখী অবস্থান, অর্থাৎ প্রথমে একটি কথার পরিষ্কার অস্বীকার, এরপর সেটি মেনে নেওয়া–এ বিষয়টি উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তখন তাঁরা তাঁর ভিন্ন অবস্থান উপেক্ষা করে আলমী শুরার জন্য এগারো সদস্যবিশিষ্ট এবং মারকাযে নিজামুদ্দিনের শুরার জন্য পাঁচজনের নাম চূড়ান্ত করে তার ওপর লিখিত স্বাক্ষর করে জানিয়ে দেন। সাহেবজাদা সাল্লামাহু তখন বেদনাহত হয়ে ভাঙা মনে দিল্লি ফিরে আসেন।

পরের দিনই নিজের সমর্থকদের দিল্লিতে ডেকে এনে তাদের উদ্দেশে কয়েকটি নির্দেশনা জানিয়ে দেন। যেমন–ওখানে কোনো শুরা গঠিত হয়নি। ওখানে আমাকে অপমান করা হয়েছে, আর এ কাজে দিল্লির কয়েকজন সদস্যও জড়িত ছিল। আপনাদের দায়িত্ব হলো, আপনারা তাদেরকে ও তাদের সমমনাদেরকে বয়কট করবেন। শুধু এতটুকুই নয়, তিনি নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে নির্দেশ করেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মারকাযে আসা ঠিক হবে না।" তাঁর এই সিদ্ধান্তে তাবলীগের ইতিহাসে এবারই সর্বপ্রথম হরতাল পালিত হয়। তাঁর অনুসারী কর্মীরা মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে সব মসজিদ প্রদক্ষিণ করে সেখানকার লোকদের মারকাযে আসতে বারণ করে, এবং কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে খুবই উত্তেজনাকর বক্তব্য প্রদান করে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। ফলে নভেম্বরের শেষ দিকের ও ডিসেম্বরের শুরুর দিকের বৃহস্পতিবারগুলোতে শহরের মেহনতি সাথিদের বড় একটি অংশ মারকাযে আসেনি। তাজ্জবের বিষয় হলো, প্রথমে তো তিনি শুরা গঠনের বিরুদ্ধে শক্তভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং এ সিদ্ধান্ত ঠুকরে দিয়েছিলেন, কিন্তু এরপর এক মাস না যেতেই ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সেই শুরার পাঁচ সদস্যের সঙ্গে আরো চারজন সদস্যের নাম যুক্ত করে একটি চিঠি সেই যিম্মাদারদের খিদমতে প্রেরণ করেন, যাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে তিনি মারকাযে ফিরে এসেছিলেন। ওই যিম্মাদার হযরতগণ এই অতিরিক্ত সংযোজনকে অসঙ্গত ও অপ্রয়োজনীয় অভিহিত করে পূর্বের গঠিত শুরার অধীনেই তাবলীগের মেহনত চলমান থাকবে। শুরার সদস্যগণ পালাবদল করে ফয়সালা তথা সিদ্ধান্তদাতার দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানিয়ে দেন। কিন্তু এবারও তিনি সেই সিদ্ধান্ত তোয়াক্কা করলেন না। (নিজামুদ্দিন মারকায ও নেপথ্যের কিছু সত্য)

হায় আফসোস! কোথায় গেল আকাবীর ও পূর্বের মুরব্বিদের সেই এখলাস। মাওলানা সা'দ সাহেবের পূর্বসূরিগণ কি ধরনের এখলাসের পরিচয় দিয়েছিলেন আর তিনি করছেনটা কী? তাঁর পিতা মাওলানা হারুন সাহেবের ভক্তবৃন্দ তাঁকে আমীর বানানোর জন্য কত বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করল, কিন্তু তিনি তাদেরকে আস্কারা না দিয়ে দমিয়ে দিয়ে ছিলেন। আর আজ তাঁর উত্তরসূরি হয়ে মাওলানা সা'দ সাহেব আমীর হওয়ার জন্য দাওয়াতের মেহনতকে টুকরা টুকরা করে ফেললেন, মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তম ঐক্যে ফাটল ধরালেন। হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) এ ব্যাপারে পূর্বেই সতর্ক করে গিয়েছেন। আমীর দাবি করতে গেলেই উম্মতের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হবে। তিনি বলেছিলেন,

دین کی جڑیں کاٹنے والی چیز انتشار ہے، میں امیر بنوں، میری بات چلے، میں اگر چہ حقیر فقیر لیکن میری بات کیوں نہیں مانی گئی، یہ سب انتشار پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار انتشار اور افتراق ہے اجتماعت جتنی ہوگی کام کی جڑیں اتنی ہی مضبوط ہونگی (سوانح ۳/۱۹۱)

বিভেদ দ্বীনের শিকড় কেটে দেয়। আমি আমীর হব, আমার কথাই চলবে। অথবা আমি যদিও ছোট হই বা তুচ্ছ হই কিন্তু আমার কথা শোনা হলো না কেন? এমন মনোভাবই বিভেদ সৃষ্টির উৎস। শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে বিভেদ ও দলাদলি। জোড়মিল যত বেশি হবে কাজের গোড়া ততই মজবুত হবে। (সা. মা. এ-৩/১৯১)

ভিন্ন চোখে কওমী মাদরাসা-১৭

মাওলানা কাসেম শরীফ

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে শিক্ষা ও শিক্ষাকেন্দ্র

৬৩২ থেকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ইসলামের ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ হিসেবে পরিচিত।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত শাসনামলের সমষ্টিকে খোলাফায়ে রাশেদা বা ইসলামের চতুষ্টয় খলীফার যুগ বলা হয়। তাঁরা মহানবী (সা.)-এর আদর্শ সম্পূর্ণ অনুসরণ করে ইসলামী শিক্ষার প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা হুবহু অনুসরণের পাশাপাশি অনুরূপ আরো বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। খোলাফায়ে রাশেদার আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার আরবের সীমা অতিক্রম করে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল। তাই ইসলামী শিক্ষার প্রসার নিয়েও তাঁদের নতুনভাবে ভাবতে হয়েছিল।

এ যুগের প্রথম দিকে কোনো সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। প্রাথমিকভাবে মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসার হয়। হযরত উমর (রা.) ইসলামী শিক্ষার ওপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কুফা, দামেস্ক ও বসরায় বিদ্বান ব্যক্তিদের নিয়োজিত করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তিনি কোরআন বিশেষজ্ঞদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তাঁরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন মসজিদে পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের ওপর বক্তৃতা দিতেন। এসব বক্তৃতাকে 'মাওয়েজা' বলা হয়। খলীফা উমর (রা.) এসব বক্তৃতা শোনার জন্য জনগণকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাসূলে কারীম (সা.)-এর ওফাতের পর ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি মদীনায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), আবু হুরায়রা (রা.), যায়েদ বিন সাবিত (রা.) প্রমুখকে নিযুক্ত করেছিলেন। অন্যদিকে মক্কায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে, কুফায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে নিযুক্ত করেছিলেন। বসরায় হযরত আবু মুসা আল আশআরী (রা.)-কে, সিরিয়ায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-কে, মিসরে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে, দামেস্কে হযরত আবুদারদা (রা.) প্রমুখ সাহাবীকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মসজিদভিত্তিক দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৪০০০ ছাত্র ও দামেস্কের মসজিদভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬০০ ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য জমায়েত হতো।

হযরত আলী (রা.) জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার জন্য রাসূলে কারীম (সা.)-এর কাছে থেকে 'জ্ঞানের দ্বার' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি মদীনার মসজিদে দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, হাদীস, ইতিহাস, আরবী ব্যাকরণ, কাব্য ও ইতিহাসের ওপর সাপ্তাহিক বক্তৃতা দিতেন।

ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্ররূপে কুফা ও বসরা

হযরত উমর (রা.) কুফা শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তিনি এ নগরীকে আল্লাহর রহমত ও ঈমানের ভাণ্ডার বলে অভিহিত করেন। চিঠিপত্রে তিনি একে আরবের মুকুটমণি বলেও উল্লেখ করতেন। হযরত আলী (রা.) কুফাকে খেলাফতের কেন্দ্রস্থল বানিয়েছিলেন। কেননা এক হাজারের অধিক সাহাবী এ নগরীতে বসবাস করতেন। তাঁদের মধ্যে এমন ২৪ জন সাহাবাও ছিলেন, যাঁরা বদরের যুদ্ধে বিশ্বনবীর সঙ্গে শরীক হয়েছেন। এসব সম্মানিত সাহাবীর বসবাসের ফলে গোটা কুফা নগরী তখন হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। (চারি ইমামের জীবনী, মৌলভী মুজাফফর হোসাইন, পৃষ্ঠা ১২-১৬)।

হযরত উমর (রা.) বসরা নগরীরও ভিত্তি স্থাপন করেন। এ নগরী কুফার মতো ইসলামী শিক্ষা প্রচারের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। মক্কা ও মদীনার মতো কুফা ও বসরা ইসলামের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। মসরুফ বিন আজদার, উমাইদ বিন উমর, আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ, জার বিন হাবশ, আবদুর রহমান আবী লাইলা, আবু আবদুর রহমান আসসুলামী, শাবীহ বিন হারস, শারীহ বিন হাফিজ ইবনে সানান, কাহিজ বিন হাজম, হাসান বসরী, শুয়রা বিন হিজাজ প্রমুখ মনীষীরা কুফা ও বসরা শহরে বসবাস করেন। (চারি ইমাম, পৃষ্ঠা ১২)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষে হযরত

আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলের ইসলামী শিক্ষার যে বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ হলো :

১. কোরআন মাজীদ, হাদীস ও ফিকাহ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো।

২. কোরআন ছাড়া অন্য বিষয় মুখস্থ পড়ানো হতো।

৩. শিক্ষকরা ছাত্রদের থেকে কোনো বেতন নিতেন না। এমনকি হাদিয়াও নিতেন না।

৪. ইলম অন্বেষণের জন্য সফর করা জরুরি ছিল। মসজিদগুলো ও সাহাবাদের আবাসভূমি শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

উমাইয়া যুগে শিক্ষা

খোলাফায়ে রাশেদার পরে ইসলামের ইতিহাসে সুদীর্ঘ সময় ধরে আরবের ঐতিহ্যবাহী কোরাইশ গোত্রের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শাখা উমাইয়া ও হাশেমীয়রা মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসন করেন। তাঁরাও খিলাফত শব্দ ব্যবহার করেন। উমাইয়া খিলাফত ছিল ৬৬১ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অন্যদিকে আব্বাসী খিলাফত ছিল ৭৫০ থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। খিলাফত দুটির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উমাইয়া খিলাফত আমলে ইসলামের বিজয়কেতন উড্ডয়ন ও মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রসারের দিকে তাঁদের মনোযোগ ছিল। অন্যদিকে আব্বাসী যুগে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও জাগতিক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।

উমাইয়া আমলে শিক্ষাব্যবস্থার দুটি রূপ পাওয়া যায়–১.খলীফা ও অভিজাত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা, ২. সাধারণ লোকদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষাব্যবস্থা। খলীফা ও অভিজাত পরিবারের সন্তান-সন্ততির শিক্ষা ছিল গৃহভিত্তিক। পিতা ও গৃহশিক্ষক পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সন্তানের লেখাপড়ার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করতেন। এ পাঠক্রমের বিশেষ দৃষ্টি ছিল উচ্চ মর্যাদাবান, সাহসিকতাপূর্ণ ও রণকৌশলে নিপুণ শাসক তৈরি করা। জনসাধারণের ছেলে-মেয়েরা মসজিদে ও মসজিদসংলগ্ন মক্তবে লেখাপড়া করত। যেমন–হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রথম জীবনে শিক্ষক ছিলেন। আল কাউইনি লিখেন, 'Hajjaj began life as a mere teacher of the young'. এখানে young বলতে বালক ও বালক ভৃত্যকে বোঝানো হয়েছে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আমীর-উমারাদের সন্তানদেরও পড়াতেন। তাঁর শিক্ষকতা জীবনে মক্তবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব মক্তবে শিশু থেকে কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা লাভ করত। অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করে ফেলবে, অথবা মসজিদের পবিত্রতা সংরক্ষণে অসমর্থ্য হবে–এ কারণে তাদের লেখাপড়ার জন্য মসজিদসংলগ্ন স্থানে ও লোকালয়ে আলাদা প্রতিষ্ঠান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো কুত্তাব বা আধুনিক পরিভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। মক্তবের শিক্ষকদের মুয়াল্লিমুস সিবইয়ান বা শিশু-শিক্ষক বলা হতো। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। বিষয়টি হলো, মসজিদ মূলত নামায ও ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্মিত। তাই মসজিদের সম্মান বিনষ্ট হওয়ার কর্মকাণ্ড মসজিদে করার অনুমতি ইসলাম দেয়নি। মুসলমানদের শিশুদের কোরআনী শিক্ষা দেওয়ার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকলে অপারগতার ক্ষেত্রে মসজিদের পবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞাত শিশুদের মসজিদে ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি আছে। মসজিদের বাইরে ভিন্ন কোনো ঘরে শিক্ষার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে থাকবে। যত দিন পর্যন্ত এর ব্যবস্থা না হয়, তত দিন প্রয়োজনে বুঝবান শিশুদের মসজিদে শিক্ষা দিতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মসজিদের আদব সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করবে। তবে অবুঝ বাচ্চাদের থেকে মসজিদকে মুক্ত রাখবে। (আলবাহরুর রায়েক : ৫/২৫০)। হাদীস শরীফে এসেছে, 'তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে শিশু, পাগল, ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, হৈচৈ, দণ্ডবিধি কার্যকরকরণ ও উন্মুক্ত অস্ত্র বহন থেকে হেফাজত করো। তোমরা তার দরজাগুলোর কাছে (বাইরে) শৌচকর্মের জন্য ঢিলা রাখো এবং জুমু'আর দিন তাকে সুগন্ধময় করো।' (ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৭৫০)

আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে সকালবেলায় বাচ্চাদের মক্তব খুলে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। মুসলিম শিশুদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য মক্তবব্যবস্থা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজকে আরো বেগবান না করলে মুসলিমসমাজ থেকে ইসলামী শিক্ষা ও চেতনা উঠে যাবে। ইদানীং স্কুলগুলোতে মর্নিং শিফট চালু হওয়ায় অনেকেই মক্তবের এই ন্যূনতম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটি তাদের দ্বীন শেখার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেননা মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মৌলিক শিক্ষা যদি না থাকে, তাহলে আদর্শ মানুষ হতে পারে না। অন্যদিকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। তবে এর পাশাপাশি মসজিদের আদব রক্ষা করাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এমন কোনো বাচ্চাকে মসজিদে আনা ঠিক নয়, যে

এখনো মসজিদের আদব রক্ষা করার উপযুক্ত হয়নি। কিন্তু মুসলমানদের সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকলে অপারগতার ক্ষেত্রে মসজিদের সম্মান সম্পর্কে অবগত শিশুদের মসজিদে ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায়। (ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত ৯/২৭, আদদুররুল মুখতার : ৬/৪২৮)। কিন্তু অবশ্যই সেটা হতে হবে বিনিময় ছাড়া। বাচ্চাদের থেকে বেতন নিয়ে মসজিদে ইসলামী শিক্ষা বা কোরআন শরীফ শিক্ষা দেওয়া জায়েয নেই। (আল বাহরুর রায়েক : ৫/২৫০)

তাই কোমলমতি শিশুদের দ্বীনি শিক্ষার জন্য মসজিদের বাইরে কোনো জায়গার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। 'ফাতাওয়ায়ে শামী'র ভাষ্য স্মরণ রাখা চাই, মসজিদকে এ কাজের জন্য বানানো হয়নি। যদিও অপারগতার ক্ষেত্রে জায়েয। (ফাতাওয়ায়ে শামী : ১/৬৬৩)

উমাইয়া যুগে শিক্ষার বিষয়বস্তু :

১ কোরআন, ২. হাদীস, ৩. হালাল-হারামের বিধান ৪, বক্তৃতা, ৫. কবিতা, কাসীদা ও গজল ৬, আরবী ব্যাকরণ, ৭. ইসলামের বিজয় ইতিহাস বা মাগাজী।

এ ছাড়া সাঁতার, তীর নিক্ষেপ, শিক্ষা সফর ও ঘোড়দৌড় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইবনে সা'দের মতে, উমাইয়া যুগে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো দুইভাবে–১. ধর্মবিষয়ক ও ২. দেহ বা প্রকৃতিবিষয়ক।

শিক্ষা ক্ষেত্রে উমাইয়া যুগের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল, এ যুগে কোরআনের তাফসীর ও মহানবী (সা.)-এর হাদীস সংকলন করা হয়।

সামগ্রিকভাবে হাদীস সংকলন করা হয়েছিল হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রা.)-এর শাসনামলে। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) ৯৯ হিজরী সনে খলীফা মনোনীত হয়েছেন। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল দুই বছর পাঁচ মাস। ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার কারণে তিনি ইসলামের পঞ্চম খলীফা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসলামী জীবনযাপন ও খিলাফত পরিচালনার জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাবেয়ীরাও দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে শুরু করেছেন। যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরাও আর বেশি দিন থাকবেন বলে মনে হয় না। তাই অনতিবিলম্বে এই মহান সম্পদ সংগ্রহ ও সংকলন করা জরুরি। এটা ভেবেই তিনি ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিম্নোক্ত ফরমান লিখে পাঠিয়েছেন,

انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه

'রাসূল (সা.)-এর হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা লিপিবদ্ধ করো।' (সুনানে দারেমী)

মদীনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাযমকেও তিনি নিম্নোক্তভাবে ফরমান লিখে পাঠিয়েছেন। সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عن عبدالله بن دينار قال: كَتَبَ عُمَرُبْنُ عَبْدِالْعَزِيزِإِلَى أَبِى بَكْرِبْنِ حَزْمٍ: انْظُرْمَاكَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهُ فَإِنِى خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ

'আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রহ.) বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) আবু বকর বিন হাযম (রহ.)-এর কাছে এ মর্মে লিখে পাঠিয়েছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা লিপিবদ্ধ করো।

কেননা আমি ইলমে হাদীসের ধারক-বাহকদের অন্তর্ধান ও হাদীসের ইলম বিলুপ্তির আশঙ্কা করছি।' (বোখারী, কিতাবুল ইলম)

উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম যুহুরী (রহ.)-কে বিশেষভাবে হাদীস সংকলনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন,

أول من دون العلم ابن شهاب الزهرى

অর্থাৎ সর্বপ্রথম ইমাম ইবনে শিহাব যুহুরী (রহ.) হাদীস সংকলনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। (জামিউ বয়ানিল ইলমী ওয়া ফাদ্বলিহী)

উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ফরমান জারি করার পর বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। ১০১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তাঁর ফরমানের ফলে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের যে প্রবাহ শুরু হয়েছিল, তা পরের কয়েক শ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাবেয়ীরা বিভিন্ন শহরে উপস্থিত থাকা সাহাবী বা তাবেয়ীদের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতেন। হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবেয়ী ও তাবেতাবেঈনদের এক বিশাল কাফেলা সাহাবা ও প্রবীণ তাবেয়ীদের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্রিত করতে থাকেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : পীর-মুরীদি

মুহাম্মদ আল আমিন
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমান সমাজে একটি স্লোগান উঠেছে তা হলো "পীর-মুরীদি বর্জন করি, কোরআন-হাদীস আঁকড়ে ধরি"–এ কথার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে পীর-মুরীদি কোরআন-হাদীসের খেলাফ। এটা কি আদৌ সঠিক? আমাদের আকাবীরে দেওবন্দ তো পীর-মুরীদি করে থাকেন। মোটকথা হলো, পীর-মুরীদিকে কি কোরআন-হাদীস সমর্থন করে?

কোরআন-হাদীসের আলোকে উত্তর প্রদানে হুজুরের সুমর্জি কামনা করছি।

সমাধান :

পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে বর্তমান সমাজের মাঝে প্রচলিত 'পীর-মুরীদি বর্জন করি, কোরআন-হাদীস আঁকড়ে ধরি'–এমন কথা একটি বিভ্রান্তিমূলক স্লোগান। কারণ পীর-মুরীদি নতুন কোনো বিষয় নয়, বরং তা রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের সোনালি যুগ থেকে ধারাবাহিবভাবে চলে আসছে। কেননা পীর-মুরীদি বাইয়াতের অপর নাম এবং আরবীতে পীরকে মুর্শিদ ও মুরীদকে মুস্তারশিদ বলা হয়। শুধু পার্থক্য এতটুকু যে যদি মুর্শিদ ও মুস্তারশিদের মাঝে নবী ও উম্মতের সম্পর্ক হয়, তাহলে নবী (সা.) ও সাহাবা (রা.) বলা হয়, আর যদি তাদের মাঝে উম্মতের সম্পর্ক হয়, তাহলে পীর ও মুরীদ বলা হয়।

পীর-মুরীদি মূলত কোরআনের বাণী, "ওই ব্যক্তি সফলকাম যে আত্মশুদ্ধি করেছে।" (সূরা আ'লা-১৪)

এবং সূরা তাওবার আয়াত ১১৯ "তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন করো।" এর ওপর যথাযথ আমলের বহিঃপ্রকাশ এবং সহীহ বোখারী, সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ ইত্যাদিতে বর্ণিত সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ। সুতরাং পীর-মুরীদি আত্মশুদ্ধির জন্য এক জরুরি বিষয়।

তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে বর্তমানে একদল অসাধু লোক পীর-মুরীদির ব্যবসায় নেমেছে, যারা সর্বদা শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে। তাদের থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তাই এসব ভণ্ড পীর ও মুরীদের ব্যাপারেই কেবল বর্তমান সমাজের মাঝে প্রচলিত স্লোগান "পীর-মুরীদি বর্জন করি, কোরআন-হাদীস আঁকড়ে ধরি" প্রযোজ্য হতে পারে। (সূরা তাওবাহ-১১৯, সূরা মুমতাহিনা-১২, বোখারী শরীফ-১৮)

প্রসঙ্গ : কোরবানীর দিনগুলোতে হাঁস-মুরগি জবাই করা

মাওলানা নাজমুল হাসান
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের কোনো কোনো আলেম মাহফিলে বলেন যে কোরবানীর ঈদের তিন দিন কোনো হাঁস, মুরগি ও পাখি জবেহ করা জায়েয নেই। তাঁদের কথাটি শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু সত্য বা নির্ভরযোগ্য–দলিল-প্রমাণসহ জানতে চাই।

সমাধান :

কোরবানীর ঈদের তিন দিন হাঁস, মুরগি, ও পাখি ইত্যাদি জবেহ করা জায়েয আছে। তবে এগুলোর দ্বারা কোরবানী করা যাবে না। কেহ যদি হাঁস-মুরগি জবেহ করে আর বলে যে এটাই গরিবের কোরবানী তাহলে তা জায়েয হবে না। (আদদুররুল মুখতার-৬/৩১৩, আহসানুল ফাতাওয়া-৭/৪৮৫)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
শরীয়তপুর।

জিজ্ঞাসা :

এক মহিলা তার মেয়ের বিবাহ এক ছেলের সাথে ঠিক করে। তারপর তাদের পরিবারের সাথে ছেলের প্রায়ই ফোনে কথা হয়। একপর্যায়ে মেয়েকে বাদ দিয়ে মেয়ের মায়ের সাথে ছেলের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একদিন ওই ছেলে মেয়ের বাড়িতে এসে ঘরের ভেতর দরজা বন্ধ করে দীর্ঘক্ষণ সময় মেয়ের মায়ের সাথে কাটায়। তাই গ্রামের মানুষের মাঝে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছে যে তারা যিনা করেছে। কিন্তু তারা বলে আমরা যিনা করিনি। তবে

কামভাবের সাথে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছি। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত মহিলার মেয়েকে ওই ছেলের বিবাহবন্ধনে দেওয়া যাবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে উল্লিখিত সুরতে কামভাবের সহিত জড়িয়ে ধরার কারণে ছেলের বীর্যপাত না ঘটলে উক্ত মহিলার মেয়ে ওই ছেলের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে গেছে। বিধায় ওই মেয়েকে তার বিবাহবন্ধনে দেওয়া যাবে না। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২৭৪, ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়া-১৯৩, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ-৭/৩৫২)

প্রসঙ্গ : কবর জিয়ারত

হাজী হাফেজ আ. খালেক
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের সমাজে অনেক পূর্ব থেকে সামাজিকভাবে নিয়ম চলে আসছিল যে ঈদের ময়দানে ঘোষণার মাধ্যমে পরদিন কোদাল, কাঁচি ও খোন্তা দিয়ে কবরস্থান পরিষ্কারকরত উপস্থিত উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াত এবং দু'আ করা হতো। ক্রমান্বয়ে বর্তমানে এসে শুধু ঈদগাহে ঘোষণার মাধ্যমে পরদিন সম্মিলিতভাবে কোরআন তেলাওয়াত ও দু'আ করা হয়। কবস্থানের পরিষ্কারের কাজ ততটা মূল উদ্দেশ্য হয় না। জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত দুই পদ্ধতিতে কবর জিয়ারত ও দু'আর এহতেমাম করা কতটা শরীয়তসম্মত? দলিলসহ বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।

সমাধান :

কবর জিয়ারত করা একটি মুস্তাহাব আমল। রাসূল (সা.) স্বীয় উম্মতদের কবর জিয়ারতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। যার সুন্নাত তরীকা হলো, কবরস্থানে গিয়ে সালাম প্রদানপূর্বক দু'আ-দরুদ ও কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি করে মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সওয়াব করা। উক্ত ইবাদত পালনের জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো সময় বা দিন নির্ধারণ করা হয়নি। যেকোনো সময় বা যেকোনো দ্বীনি আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া কবর জিয়ারত করা যেতে পারে।

প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি তথা : (শুধুমাত্র ঈদের পরের দিন কবর জিয়ারত করা) যেহেতু সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই উক্ত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত বলে বিবেচিত হবে না। বরং এমন প্রথাগত জিয়ারত বাদ দিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ সময়-সুযোগমতো কবর জিয়ারত করবে। (মুসলিম শরীফ-১/৩১৪, বাদায়ে উস সনায়ে-১/৩২০, কিফায়াতুল মুফতী-৪/১৮৯)

প্রসঙ্গ : যাকাত/টুপি

আখয়ারুল হক
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

১. আমি বিনিতভাবে জানতে চাই যে, যাকাতের টাকা একসাথে না দিয়ে মাসিক ভিত্তিতে কোনো গরিব আত্মীয়কে দেওয়া যাবে কি না?

২. টুপি পরা সম্পর্কিত সহীহ হাদীস ও হাদীসের উৎস কী?

৩. টাখনুর ওপর কাপড় পরা বাধ্যতামূলক কি না? এই সম্পর্কে হাদীসের উৎস কী? আমাকে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর বলে বাধিত করবেন।

সমাধান-১ :

যাকাতের টাকা মাসিক ভিত্তিতে গরিব আত্মীয়কে দেওয়া যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে নিয়্যাতের প্রতি খুবই লক্ষ রাখতে হবে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ যাকাতের টাকা পৃথক করার সময় নিয়্যাত করতে হবে অন্যথায় প্রতি মাসে যাকাত আদায়ের সময় নিয়্যাত করতে হবে। (আদ দুররুল মুখতার-১/১৩০, বাহরুর রায়েক-২/২১০, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া-৩/৪৯২)

সমাধান-২ :

টুপি পরিধান করা রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (মুসলিম শরীফ-৩৭২, মিশকাত শরীফ-২/৩৭৪, বোখারী শরীফ-২/৩৬৩)

সমাধান-৩ :

টাখনুর ওপর কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য বালেগ হওয়ার পর থেকে নিয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সর্বাবস্থায় বাধ্যতামূলক। (বোখারী শরীফ-২/৮৬১, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ-১৬/১৪৬)

প্রসঙ্গ : আত্মহত্যাকারীর দাফন

হাজী আ. খালেক
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

গলায় ফাঁস অথবা অন্য যেকোনোভাবে আত্মহত্যা করে মারা যাওয়ার পর লাশ মুসলমানের সামাজিক কবরস্থানে কিংবা পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা যাবে? না তার লাশ পৃথক কোনো জায়গায় দাফন করতে হবে? যা আমাদের সমাজের মানুষের বক্তব্য, এ

ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? বিস্তারিত দলিলসহ জানতে চাই এবং কবরস্থানে তার লাশ দাফনের আলাদা জায়গা নির্ধারণ করা যাবে কি?

সমাধান :

আত্মহত্যা যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম, কিন্তু আত্মহত্যার কারণে কোনো ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় না। বরং মুসলমানই থেকে যায়। তাই তার লাশ মুসলমানদের সামাজিক কবরস্থানে কিংবা পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করতে শরীয়তে কোনো আপত্তি নেই। (সূরা নিসা-৪৮, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/১৯৬, ফাতাওয়ায়ে কাসেমিয়া-৯/৭১৮)

প্রসঙ্গ : কোরবানীর গোশত বণ্টন

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান
মধুপুর, টাঙ্গাইল।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের সমাজে কোরবানীর গোশত বণ্টনের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম প্রচলন আছে তা হলো, কোরবানীর স্থানে কোরবানীর এক-তৃতীয়াংশ গোশত সমাজপতিদের নিকট জমা দেওয়া হয়, অতঃপর জমাকৃত গোশত থেকে কোরবানীদাতাসহ সমাজের সর্বস্তরের লোকদের বণ্টন করে দেওয়া হয় এবং কখনো দেখা যায়, জমাকৃত গোশতে মান্নত বা অসিয়তের গোশতও থাকে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টি কতটুকু সমর্থিত? এবং এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় কী? কোরআন-সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

কোরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে রাখা, অপর ভাগ গরিব-মিসকিনদের দেওয়া এবং আরেক ভাগ আত্মীয়-স্বজনদের দেওয়া মুস্তাহাব, ইচ্ছা করলে সব গোশত নিজেও খেতে পারে বা গরিবদের মাঝে সকল গোশত বিতরণ করে দিতে পারে, অর্থাৎ এই ব্যাপারে কোরবানীদাতার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তাই এর মধ্যে সমাজপতি বা অন্য কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। বিশেষত কোরবানীটি মান্নত কিংবা অসিয়তের হলে। অতএব সমাজপতিদের জন্য এভাবে কোরবানীর গোশত নেওয়ার প্রথাটি বর্জনীয়। (মুসনাদে আহমদ-২/৩৯১, বাদায়ে উস সনায়ে-৬/৩৯২, রদ্দুল মুহতার-৬/৩২৮)

প্রসঙ্গ : আকদের পর খুরমা বিতরণ

মাওলানা নাজমুল হাসান
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

বিবাহশাদিতে আকৃদের পর মিষ্টি বা খুরমা বিতরণ করা হয়। কোনটি সুন্নাত? মসজিদে বিবাহ সম্পন্ন হলে বিবাহের পর মিষ্টি বা খুরমা দেওয়ার পদ্ধতি কী?

ছিটিয়ে দেওয়া সুন্নাত, না হাতে হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া, না দস্তরখানে দেওয়া–ইহার বিস্তারিত হুকুম নির্ভরযোগ্য শরয়ী দলিলসহ জানতে চাই।

প্রকাশ থাকে যে ছিটিয়ে দিলে এইগুলো পাওয়ার জন্য ভীষণ ধাক্কাধাক্কি ও হুড়াহুড়ি হয়, এমনকি অনেকে খুরমা পায় না, আবার কষ্ট ও ব্যথা পায়।

সমাধান :

মসজিদ আল্লাহর ঘর ও সর্বোত্তম স্থান। আর বিবাহ একটি ইবাদত। সুতরাং বিবাহের আকৃদ মসজিদে হওয়াই উত্তম। তার পাশাপাশি বিবাহের আকৃদের অনুষ্ঠানে মসজিদের আদব, সম্মান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অতীব জরুরি। তাই বিবাহের আকৃদের পর খুরমা ছিটিয়ে দিলে যদি তাতে ধাক্কাধাক্কি, শোরগোল বা উচ্চবাচ্য হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে হাতে হাতে বা দস্তরখান বিছিয়ে দেওয়া উত্তম। আর বিবাহের আকৃদে মিষ্টিজাতীয় জিনিস তথা খুরমা ইত্যাদি বিতরণ করা মুস্তাহাব। (তাওবাহ-১৮, রুহুল মাআনি-১০/২৫৭)

প্রসঙ্গ : বিনিময়

আব্দুস সাত্তার
হিজলা, বরিশাল।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের স্কুলে কোনো কোনো লাইব্রেরি যেমন পপি, আলফাতাহ্ ইত্যাদির মালিক এসে বলেন যে আমাদের বইগুলো আপনাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কেনার জন্য বলেন এবং তাঁরা এর বিনিময় হিসেবে মোটা অংকের কিছু টাকা দিয়ে যান।

জানার বিষয় হলো, উক্ত টাকা শিক্ষকদের জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

পারিশ্রমিক কাজের বিনিময়ে হয়ে থাকে। কোনো কিছুর দিকে শুধুমাত্র ইশারা বা পথপ্রদর্শনকে ফুকাহায়ে কেরাম কাজের অন্তর্ভুক্ত করেননি। বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে তথা

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শুধুমাত্র বই ক্রয় করার কথা বলার বিনিময় হিসেবে শিক্ষকদের জন্য কোনো টাকা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (রদ্দুল মুহতার-৬/৯৫, কিতাবুন নাওয়াযেল-১২/৩৮৬, আহসানুল ফাতাওয়া-৭/৩০৭)

প্রসঙ্গ : খতম তারাবীহ

মুহাম্মদ ইমদাদুল হক্ব
মজলিশপুর, বি-বাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদের হাফেজ সাহেবগণ দ্রুত তেলাওয়াত করেন যার দরুন কী পড়েন বা কোথায় থেকে পড়েন–কিছু বোঝা যায় না, আবার কখনো মাইকের আওয়াজ মসজিদের ভেতরে থেকেও শোনা যায় না। আমার জানার বিষয় হলো, শোনা বা বোঝা না গেলেও কি খতমে তারাবীহের সওয়াব হবে, নাকি শুধু নামাযের সওয়াব হবে–এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

তারাবীর নামায অন্যান্য নামাযের তুলনায় একটু দ্রুত পড়ার কথা রয়েছে, তবে এমন দ্রুত নয়, যার দরুন তেলাওয়াত স্পষ্ট বোঝা যায় না এবং সহীহ-শুদ্ধও হয় না। যদি এ রকম হয় তাহলে সওয়াবের জায়গায় গোনাহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এ ধরনের তেলাওয়াত থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। আর তেলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার পর কোনো কারণে বোঝা বা শোনা না গেলেও খতমের সওয়াব পাওয়া যাবে। (আদ দুররুল মুখতার-১/৮০, ফতওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ-৪/২৫৭, আপকে মাসায়েল আউর উনকা হল-৪/১৯৭)

প্রসঙ্গ : আকীকার জন্তু

মুহাম্মদ আব্দুর রহমান
দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমি একটি গরু ক্রয় করেছি, কিন্তু আমার জানা নেই গরুটির দুই বছর হয়েছে কি না এবং জানার কোনো ব্যবস্থা নেই। এমন গরু দ্বারা আকীকা সহীহ হবে কি না? এবং একটি গরু দ্বারা সাত ছেলের আকীকা সহীহ হবে কি না?

সমাধান :

গরু দ্বারা আকীকা করতে হলে গরুর বয়স দুই বছর পূর্ণ হতে হবে। দুই বছরের কমে আকীকা শুদ্ধ হবে না। আর বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি রয়েছে– (১) গরুর নতুন দাঁত গজানো। কারণ দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগে সাধারণত দাঁত গজায় না। (২) দাঁত দেখে চেনার উপায় না থাকলে গরুর বয়স সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের থেকে বয়স জেনে প্রবল ধারণায় উপনীত হওয়া। অতঃপর উক্ত গরু দ্বারা আকীকা করা। উল্লেখ্য, সাতজন ছেলের জন্য একটি গরু দ্বারা আকীকা করা বৈধ। (বাদায়েউস সানায়ে-৬/২৯৯, হিন্দিয়া-১/৩০৪, ফাতাওয়ায়ে কাসেমিয়া-২২/৩৭৪)

প্রসঙ্গ : পরকীয়া

মুহাম্মদ ইফতি
সাভার, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

একটি ছেলে একটি মেয়ের সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলন করে। তারপর ১০ তারিখে মিলন করে। ১৯ তারিখে মেয়ের মাসিক আটকে যায়। ২৪ তারিখে ডাক্তার দিয়ে নষ্ট করে ফেলে।

প্রশ্ন : এই অবৈধ বাচ্চার ভ্রূণ নষ্ট ২৪ দিনের, এই জন্য আল্লাহর থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে, কী করলে গোনাহ মাফ হবে?

প্রশ্ন : সূরা নিসার ৯৩ আয়াত অনুযায়ী সে কি চির জাহান্নামী, নাকি তার মুক্তির পথ আছে?

প্রশ্ন : তার বিগত দিনের না পড়া নামাযের কিভাবে পূরণ করতে পারে?

সমাধান-১ :

খাঁটি দিলে তাওবা করলে সকল প্রকার গোনাহ মাফের আশা করা যায়। বিধায় বিগত দিনে যে ভুল হয়ে গেছে তাতে অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি দিলে তাওবা করে নেওয়ার পর অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। সূরা নিসার ৯৩ নম্বর আয়াত আপনার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। (বাহরুর রায়েক-৮/২৭২)

সমাধান-২ :

বিগত দিনের ছুটে যাওয়া সকল নামায যথাসম্ভব হিসাব করে পর্যায়ক্রমে পড়ে নিতে হবে। (ফতওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ-১/২৬৬, আল ফিকহুল হানাফী-১/১৩২)

প্রসঙ্গ : খতমে তারাবীহ

মুহাম্মদ এমদাদুল হক
মজলিশপুর, বি-বাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদে রমাজান মাসে দুজন হাফেজ সাহেবকে তারাবীহ নামাযের জন্য রাখা হয়, তারা তারাবীহের সাথে সাথে অধিকাংশ ফরয নামাযও পড়ান। কিছুদিন পর তাদেরকে হাদিয়া দেওয়ার জন্য এলাকার প্রত্যেক ঘর থেকে নির্ধারিত

অংকের টাকা উঠিয়ে হাফেজ সাহেবকে দেওয়া হয়।

আমার জানার বিষয় হলো (ক) এভাবে এলাকা থেকে টাকা উঠানো কতটুকু শরীয়তসম্মত। (খ) চাঁদা আদায়কারী ও দানকারীগণ গোনাহগার হবে কি না? (গ) তারাবীহ পড়িয়ে এরূপ টাকা নেওয়া জায়েয আছে কি না? (ঘ) তাদেরকে টাকা দিয়ে তারাবীহ পড়ালে কোনো সওয়াব হবে কি না? কোরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানালে খুশি হব।

সমাধান :

প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী খতমে তারাবীহ পড়িয়ে এরূপ টাকা নেওয়া জায়েয নেই, বিধায় হাফেজ সাহেবদের হাদিয়ার নামে বিনিময় দেওয়ার জন্য মহল্লা থেকে টাকা উঠানোর যে প্রচলন রয়েছে তা শরীয়তসম্মত নয়, এতে চাঁদা আদায়কারী ও দানকারীগণ গোনাহগার হবে এবং টাকা দিয়ে খতমে তারাবীহ পড়ানোর কারণে খতমে কোরআনের সওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে হাফেজ সাহেবদের জন্য আসা-যাওয়া ও ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পড়ানোর জন্য যথাযথ নিয়মে বেতন ধার্য করে ইমাম নিয়োগ দেওয়া ও তাদের বেতন আদায়ের জন্য মুসল্লিদের থেকে বেতনের টাকা উঠানোর শরীয়তে অনুমতি আছে, তবে তারাবীর কোনো বিনিময় নেওয়া দেওয়া শরীয়তের আলোকে নাজায়েয। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৪/৪৪৮, এমদাদুল ফাতাওয়া-১/৪৮৪, ফতওয়ায়ে রহিমিয়া-৪/৪২২)

প্রসঙ্গ : বিয়ে

মুহাম্মদ তাফাজ্জল

ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার মায়ের আপন মামা, অর্থাৎ নানার আপন শালার সাথে সামাজিকভাবে আমার বিয়ে হয়। বর্তমানে আমার বয়স ৫২ বছর, আর সাংসারিক জীবনের বয়স ৩৫ বছর। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের বিয়ের শরয়ী হুকুম কী? এবং আমার করণীয় কী? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

সমাধান :

মায়ের মামার সাথে আপনার বিবাহ সহীহ হয়নি। বিধায় অনতিবিলম্বে আপনাদের পৃথক হয়ে যাওয়া আবশ্যক এবং কৃতকর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট সবার তাওবা করা ওয়াজিব। তবে আপনাদের ঔরষে জন্ম নেওয়া সন্তানগুলো বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। (সূরা নিসা-২৩, রদ্দুল মুহতার-৩/২৯-৩০, হিন্দিয়া-১/৫৪০)

প্রসঙ্গ : মোবাইল ব্যাংকিং

মুফতী আবু ইউসুফ

দৌলতখান, ভোলা।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত মোবাইল ব্যাংকিং তথা বিকাশ ইত্যাদিতে হাজারে ২০ টাকা করে কেটে নেওয়া হয়। যা টাকা প্রদানকারী অথবা গ্রহীতার দিয়ে দেওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন হলো বর্তমান প্রচলিত বিকাশ শরয়ী সমর্থিত কি না? এবং অতিরিক্ত টাকা নেওয়া বা দেওয়া বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

বর্তমান প্রচলিত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যে টাকা দিতে হয়, তা মূলত ওই সেবার বিনিময়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এখানে আপত্তিকর কিছু নেই। উভয় পক্ষের মাঝে পূর্বনির্ধারিত যেকোনো পরিমাণ টাকা সার্ভিস চার্জ হিসেবে নেওয়া বৈধ হবে। (হিদায়া-৩/২৯৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া-৩/১০৩, বাহরুর রায়েক-৭/২৯৭)

প্রসঙ্গ : সুদ

মুহাম্মদ আসআদ

রাউজান, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে চলছে ব্যাংকিং লেনদেন। যাতে রয়েছে ইন্টারেস্ট। আমার জানার বিষয় হলো, ইন্টারেস্ট কী? এবং ইসলামী শরীয়তে ইন্টারেস্ট বৈধ কি না? যদি বৈধ না হয় তাহলে বৈধ হওয়ার ব্যাপারে জায়েয কোনো পন্থা আছে কি না? যদি জায়েয থাকে তাহলে কোন ধরনের ব্যাংক থেকে ইন্টারেস্ট নেওয়া যাবে। যদি আপনাদের অনুসন্ধানে এমন কোনো ব্যাংক থাকে তাহলে দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

ইন্টারেস্ট মূলত একটি ইংরেজি শব্দ। যার অর্থ হলো, প্রচলিত সুদি ব্যাংকের বিশেষ মুনাফা বা সুদ, যা শরীয়তে হারাম। তাই এ ধরনের ইন্টারেস্ট নেওয়া বৈধ হবে না এবং সুদ বৈধ হওয়ার কোনো পন্থা নেই। তবে শরয়ী নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবসা করে মুনাফা ভোগ করার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। চাই মুদারাবার নামে হোক, চাই

মোশারাকার নামে। (রদ্দুল মুহতার-৫/১৬৬, বাহরুর রায়েক-৬/১২৩, কিতাবুন নাওয়াযেল-১১/২৭১)

প্রসঙ্গ : ইমামতি

মুহাম্মদ আব্দুর রহমান
দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

অবিবাহিত ইমামের পেছনে নামায আদায় করা এবং বিবাহিত ইমামের পেছনে নামায আদায় করার মাঝে সওয়াবের মধ্যে কোনো কমবেশি হবে কি না?

সমাধান :

মসজিদের ইমাম যোগ্য আলেম, আল্লাহভীরু এবং সুন্নাতের অনুসারী হওয়া আবশ্যক। সুতরাং উল্লিখিত গুণে বিবাহিত বা অবিবাহিত হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। নামাযে সওয়াব কমবেশি হওয়া ইমাম বিবাহিত বা অবিবাহিত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয় বরং একাগ্রতার সাথে সুন্নাহ অনুযায়ী নামায আদায় করা, না করার ওপর। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/৮৩, আদদুররুল মুখতার-১/৫৫৬)

প্রসঙ্গ : মান্নত

মুহাম্মদ আব্দুর রহমান
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা :

এক ব্যক্তি কারো কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পায়। এখন সে যদি মান্নত করে উক্ত টাকা যখন আমার হাতে আসবে তখন তা থেকে আমি পাঁচ হাজার টাকা মসজিদে দেব। আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত টাকা হাতে আসার পর মান্নতকৃত পাঁচ হাজার টাকা মসজিদে না দিয়ে অন্য কোনো খাতে, যেমন–কোনো গরিব ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে কি না?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে মান্নতের টাকা মসজিদে দেওয়া বৈধ নয় বরং যাকাতের খাতসমূহ হতে যেকোনো খাতে ব্যয় করা জরুরি। সুতরাং উক্ত টাকা মসজিদে না দিয়ে গরিব-মিসকিনদের দিতে হবে। (আহসানুল ফতওয়া-৫/৪৮০, ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়া-২৭০)

প্রসঙ্গ : ই'তিকাফ

মুহাম্মদ নাঈম
বি-বাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

১. আমাদের মহল্লার বেশির ভাগ চাকরিজীবী বা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে রমাজান মাসে মহল্লার বাইরে থেকে কোনো একজন ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিয়ে ই'তিকাফে বসানো হয়। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, এভাবে ই'তিকাফে বসানোর দ্বারা মহল্লাবাসী ই'তিকাফে বসার জিম্মা থেকে দায়মুক্ত হবে কি না?

২. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় পাগড়ি পরার বিধান কী? এবং পাগড়ি পরিধানকৃত অবস্থায় মাথার উপরিভাগ খোলা থাকলে, অর্থাৎ টুপি দেখা গেলে মাকরূহ হবে কি না? এবং পাগড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কতটুকু হওয়া সুন্নাত ও কোন রঙের পাগড়ি পরা সুন্নাত এবং শিমলা কতটুকু রাখা সুন্নাত? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

সমাধান-১ :

ই'তিকাফের বিনিময় দেওয়া-নেওয়া–উভয়টি নাজায়েয এ ধরনের ই'তিকাফ দ্বারা মহল্লাবাসী সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ই'তিকাফ থেকে দায়মুক্ত হওয়ার আশা করা যায় না। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৬/৫৫, হিদায়া-৩/৩০৩, কিতাবুন নাওয়াযেল-৭/৪১২)

সমাধান-২ :

নামায আদায়কালে পাগড়ি পরিধান করা জায়েয বরং উত্তম; তবে এটাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া এবং পাগড়িবিহীন নামাযকে মাকরূহ বলা ঠিক নয়।

টুপি থাকা অবস্থায় মাঝে ফাঁকা রেখে গোল করে পরিধান করলে মাকরূহ হবে না।

পাগড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো শরয়ী সীমা রেখা উল্লেখ নেই। তিন, সাত, বারো হাত লম্বা হওয়ার কথা পাওয়া যায়। তাই যে পরিমাণ সম্ভব এবং রীতি ও প্রচলন হয়ে গেছে ওই পরিমাণ পরিধান করা জায়েয। যেকোনো রঙের পাগড়ি দ্বারা সুন্নাত আদায় হলেও সাদা পাগড়ি পরিধান করা উত্তম, তবে কোনো বাতিলপন্থীর সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। পাগড়ির শিমলা (প্রান্ত) দুই কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে দেওয়া উত্তম শিমলার পরিমাপের ক্ষেত্রে উত্তম হলো এক হাত বা পৃষ্ঠের মাঝখান পর্যন্ত; তবে শিমলাবিহীন এবং শিমলা ঝুলিয়ে উভয় সুরতে পাগড়ি পরিধান করা জায়েয, বেশি লম্বা করে ঝোলানো উচিত নয়। (মুসলিম শরীফ-২/৯৯০, ফয়জুল বারী-৬/৭৮, এমদাদুল ফাতাওয়া-১/৪৪২)

যে কাজে পুণ্য নষ্ট হয়

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

কোনো উত্তম বস্তু আহরণ ও অর্জন যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণও বড় জরুরি। বিশেষ করে মানুষ আখিরাতের যে সম্বল অর্জন করে তার রক্ষণাবেক্ষণ অত্যাবশ্যক।

মুসলমান অসংখ্য আমল করে, কান্নাকাটি করে, সদকা-খায়রাত করে। এর মাধ্যমে অগণিত সওয়াবও অর্জন করে। কিন্তু মানুষ জীবনে এমন এমন কাজের সম্মুখীন হয়, যার কারণে তার আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যায়। সেরূপ বিভিন্ন কাজের কথা পবিত্র কোরআন-হাদীসে পরিষ্কারভাবে উদ্ধৃত আছে। যাতে উক্ত কাজ থেকে বেঁচে থেকে নিজের অর্জিত সওয়াব ও নেক আমলগুলো হেফাজত করতে পারে। এবারের আয়োজন পবিত্র কোরআন-হাদীসে বর্ণিত সেরূপ কিছু কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কারণে মানুষ নিজের অর্জিত সওয়াবগুলো নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ আমাদের এসব কাজ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুরতাদ হওয়া :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যদি তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ দ্বীন ত্যাগ করে এবং কাফির অবস্থায় মারা যায়, তবে এরূপ লোকের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে বৃথা যাবে। তারা জাহান্নামী। তারা সেখানে সর্বদা থাকবে। (সূরা বাকারা ২১৭)

কোনো মুসলিমকে হত্যা করা :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢١) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ(٢٢)

যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ইনসাফের নির্দেশ দেয় তাদেরও হত্যা করে, তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তির দুঃসংবাদ দাও।

তারা সেই লোক, দুনিয়া-আখিরাতে যাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে আর তাদের কোনো রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না। (আলে ইমরান ২২-২৩)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যেকোনো মুমিনকে কোনো কারণ ছাড়া জুলুমবশত হত্যা করে আল্লাহ তা'আলা তার কোনো প্রকার ফরয ও নফল নামায কবুল করবেন না। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪২৭০)

শিরক করা :

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

এটা আল্লাহপ্রদত্ত হিদায়াত, যার মাধ্যমে তিনি নিজ নিজ বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান সরল পথে পৌঁছিয়ে দেন। তারা যদি শিরক করত তবে তাদের সমস্ত (সৎ) কর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত। (আল আনআম ৮৮)

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ(٦٦)

বলে দাও, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তার পরও কি তোমরা আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করতে বলো? বাস্তব কথা হলো, তোমাকে এবং তোমার পূর্বের নবীগণকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছিল, তুমি যদি শিরক করো তবে তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তুমি আল্লাহরই ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকো। (সূরা যুমর ৬৪-৬৬)

শিরকের ব্যাপারে সামান্য ব্যাখ্যা জরুরি। শিরকের বিভিন্ন প্রকার

রয়েছে। আল্লাহর জাতের সাথে শিরক, আল্লাহ তা'আলার সিফাত তথা গুণাবলির সাথে শিরক, ইবাদতে শিরক ইত্যাদি। বর্তমান সময় বিভিন্ন মহল থেকে ইবাদতের সাথে শিরকের কথা বলা হলেও জাত তথা সত্ত্বা ও সিফাতের সাথে শিরকের ব্যাপারে বলা হয় না। ইবাদতের শিরক স্পষ্ট। কিন্তু জাত ও সিফাতের বিভিন্ন বিষয়ে শিরকের ব্যাপারে সলফে সালেহীন থেকে দীর্ঘ আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা শিরক তা স্পষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জন্য মানুষ বা সৃষ্টির মতো হাত, পা, চোখ ইত্যাদি সাব্যস্ত করাও শিরক। এরূপ আকীদা যারা রাখে তাদের আকৃতি বা দেহবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন সলফে সালেহীনগণ। এরূপ আকীদা পোষণকারীদের ভ্রান্তও বলেছেন তাঁরা। তাই আমাদের যেমন ইবাদত ইত্যাদিতে শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে, তেমনি আকীদার দিক থেকে আল্লাহর জাত ও সিফাতের সাথে এসব শিরকি আকীদা থেকেও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে হবে।

কিয়ামতের বিশ্বাস না রাখা :

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও আখিরাতের সম্মুখীন হওয়াকে অস্বীকার করেছে, তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে গেছে। তাদের অন্য কিছুর নয়, বরং তারা যে সমস্ত কাজ করত তারই বদলা দেওয়া হবে। (আ'রাফ ১৪৭)

দুনিয়ার মুহাব্বতে ডুবে থাকা :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦)

যারা (কেবল) পার্থিব জীবন ও তার ঠাটবাট চায়, আমি তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ ফল এ দুনিয়ায়ই ভোগ করতে দেব এবং এখানে তাদের প্রাপ্য কিছু কম দেওয়া হবে না। এরাই তারা, যাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই এবং যা কিছু কাজকর্ম তারা করেছিল, আখিরাতে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে আর তারা যে আমল করছে (আখিরাতের হিসেবে) তা না করারই মতো। (সূরা হুদ ১৫-১৬)

খোটা দেওয়া :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে মুমিনগণ! খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের সদাকাকে সেই ব্যক্তির মতো নষ্ট করো না, যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত এই রকম–যেমন এক মসৃণ পাথরের ওপর মাটি জমে আছে, অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ে এবং (সেই মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যায় এবং) সেটিকে (পুনরায়) মসৃণ পাথর বানিয়ে দেয়। এরূপ লোক যা উপার্জন করে, তার কিছুমাত্র তাদের হস্তগত হয় না। আর আল্লাহ (এরূপ) কাফিরদের হিদায়াতে উপনীত করেন না। (বাকারা ২৬৪)

সুন্নাহবিরোধী কাজ করা :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের কর্ম বরবাদ করো না। (সূরা মুহাম্মদ ৩৩)

চুরির অর্থ থেকে সদকা করা :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

ولاصدقة من غلول

গনিমতের সম্পদ থেকে চুরি করা সম্পদের সদকা কবুল হয় না। (মুসলিম শরীফ, হা. ২২৪)

লোক-দেখানো ও দুনিয়াদারির জন্য নেক কাজ করা :

হযরত উবায় ইবনে কা'আব সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ

যে ব্যক্তি আখিরাতের কাজ তথা নেক আমল দুনিয়ার জন্য করবে আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। (সহীহে ইবনে খুজাইমা, হা. ৪০৫)

মদ্যপান :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

যে ব্যক্তি শরাব পান করল এবং তার নেশা হলো ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। যদি সে (তাওবা করা ছাড়া ওই অবস্থায়) মরে যায় তবে জাহান্নামে যাবে। যদি তাওবা করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবুল করে নেবেন। (সহীহে ইবনে হিব্বান, হা. ৫৩৫৭)

জ্যোতিষীর কাছে নিজের ভবিষ্যৎ গণনা করা :

হযরত সফিয়্যা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে এল এবং তার কাছ থেকে ভবিষ্যৎ গণণা করল, ৪০ রাত পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। (মুসলিম শরীফ, হা. [২২৩০] ১২৫)

মাতা-পিতার অবাধ্যতা এবং তাকদীর অস্বীকার করা :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :ثَلاَثَةٌ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ: عَاقٌّ، وَمَنَّانٌ، وَمُكَذِّبٌ بِقَدْرٍ

হযরত আবু উমামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন তিন প্রকার ব্যক্তির ফরয-নফল কিছুই কবুল হবে না। ১. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি, ২. ইহসান করে খোটা দানকারী, ৩. তাকদীরকে অস্বীকারকারী। (আল মুজামুল কাবীর, [তাবারানী] হা. ৭৫৪৭)

কুকুর পালন করা :

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ (ص ১৩১:) يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ক্ষেত-খামার, বাড়ি বা পশুর হেফাজতের উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর রাখবে তার নেকীসমূহ থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ নষ্ট হয়ে যাবে। (বোখারী শরীফ, হা. ৩৩২৪)

একাকী হারাম কাজে লিপ্ত থাকা :

عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ :لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا ، قَالَ ثَوْبَانُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ :أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا

হযরত ছাওবান (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, আমি আমার উম্মতের এমন লোক সম্পর্কেও জানি, যারা কিয়ামতের দিন তাহামা পাহাড়ের সমান নেকী নিয়ে আসবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উক্ত নেকীকে হাওয়ায় উড়ন্ত অনুর মতো বানিয়ে দেবেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জানিয়ে দিন। যাতে আমরা অজ্ঞতাবশত তাদের মতো না হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তারা তোমাদের ভাই এবং তোমাদের বংশের লোক, রাতে তারা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে, কিন্তু তারা একাকিত্বে হারাম কাজসমূহে লিপ্ত থাকে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা. ৪২৪৫)

মদীনা মুনাওয়ারায় বিদ'আত কাজ করা এবং বিদ'আতীদের আশ্রয় দেওয়া :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "আইর থেকে ছূর পাহাড় পর্যন্ত হারামে মদীনা। এখানে যেকোনো বিদ'আত কাজ আবিষ্কার করবে বা কোনো বিদ'আতীকে আশ্রয় দেবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মাখলুকের অভিশাপ। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির ফরয, নফল কোনো ইবাদতই কবুল করবেন না। (মুসলিম শরীফ, হা. [১৩৭১] ৪৬৯)

মুজাহিদের পরিবারের সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত হওয়া :

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلَّا نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ لَهُ :هَذَا قَدْ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ، فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ

হযরত বুরায়দা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ

(সা.) ইরশাদ করেন, মুজাহিদীনের স্ত্রীদের ইজ্জত জিহাদে না যাওয়া ব্যক্তির জন্য তার মায়ের মতো। ওই রূপ ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের সাথে খিয়ানত করলে কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে তাকে দাঁড় করানো হবে এবং মুজাহিদকে বলা হবে তার নেকীর মধ্য হতে যত নেকী চাও নিয়ে নাও। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ২৪৯৬)

স্ত্রীর প্রতি স্বামী নারাজ থাকা :

হযরত আবু উমাম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির নামায তার কানের ওপরও যায় না। তাদের মধ্যে একজন হলো

وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ

ওই মহিলা, যার ওপর স্বামী রাতভর নারাজ ছিল। (তিরমিযী শরীফ, হা. ৩৬০)

জোর খাটিয়ে ইমামতি করা :

হযরত আবু উমাম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির নামায তার কানের ওপরও যায় না। তাদের মধ্যে একজন হলো

وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

এমন ইমাম, যাকে মুসল্লিগণ (দ্বীনি কারণে) পছন্দ করে না (তার পরও সে ইমামতি করে)। (তিরমিযী শরীফ, হা. ৩৬০)

মদীনা মুনাওয়ারায় মিথ্যা কসম করা :

أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِلُّ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا

হযরত আবু উমামা ইবনে ছালাবা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার মিম্বারের কাছে শপথ করে মুসলমানের সম্পদ অবৈধ পন্থায় নিয়ে নিল তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং পুরো সৃষ্টিজগতের অভিশাপ। তার কোনো ফরয ও নফল আমল কবুল করা হবে না। (আল মুজামুল কাবীর, হা. ৫৯৭৪)

মদীনাবাসীকে সন্ত্রস্ত করা :

عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

হযরত সায়েব ইবনে খাল্লাদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ভীতি ছড়িয়ে দেবেন। তার ওপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা এবং সমস্ত মাখলুকাতের লা'নত। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার কোনো ফরয ও নফল আমল কবুল করবেন না। (মুসনাদে আহমদ, হা. ১৬৫৫৭)

সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা :

হযরত উয়াইম ইবনে সায়েদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ بِي أَصْحَابًا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَأَصْهَارًا، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

আল্লাহ তা'আলা আমাকে মনোনীত করেছেন। অতঃপর আমার কারণে সাহাবায়ে কেরামকে মনোনীত করেছেন। তাদেরকে আমার উজির, সহযোগী এবং আত্মীয় বানিয়েছেন। যে লোক তাদের সমালোচনা করবে তার ওপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা এবং সমস্ত মাখলুকের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন ওই লোকের কোনো প্রকার ফরয ও মুস্তাহাব আমল কবুল করা হবে না। (মুস্তাদরাকে হাকেম, হা. ৬৬৫৬)

নির্লজ্জ হওয়া :

হযরত মালেক ইবনে আখামীর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الصُّقُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ."فَقُلْنَا :وَمَا الصُّقُورُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ " :الَّذِي يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِهِ الرِّجَالَ

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন 'সকুর'-এর কোনো ফরয ও নফল আমল কবুল করবেন না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম–হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! 'সকুর' কাকে বলে? রাসূল (সা.) বলেন, যারা স্ত্রী-কন্যার কাছে বেগানা পুরুষের আসা-যাওয়ার প্রশ্রয় দেয়। (শু'আবুল ঈমান, [বায়হাকী] হা. ১০৩১০)

এরূপ আরো অনেক বিষয় পবিত্র কোরআন-হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর কারণে অর্জিত পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়। এখানে নমুনাস্বরূপ কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এসব কাজ থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন

প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ফাতাওয়ার কিতাব

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা

মাকতাবাতুল আবরার
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।
০১৮১৭২৬৬৩৮৬, ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

মাকতাবাতুল আযহার
মধ্যবাড্ডা আদর্শনগর, গুলশান, ঢাকা।
০১৯২৪০৭৬৩৬৫

দারুল হাদীস
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৭১২৬৪২৭০৩

আল খায়ের প্রকাশনী
বুক মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৭১৪২৬৩৯৪১

রহমানিয়া লাইব্রেরি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
০১৬১৬৮৮২৪০৯

হাবিবিয়া বুক ডিপো
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০।
০১৮২৮৫০৯৮৪৮

চট্টগ্রাম

মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেব
জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহর মাদরাসা
শুলকবহর, চট্টগ্রাম।
০১৮১৭৭৫০৩৯৮, ০১৮১৫৬০০৩৮১

আশরাফিয়া লাইব্রেরি
জামেয়া মার্কেট, ১৬০ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
০১৮১৭২০২৭১৩

আল-মানার লাইব্রেরি
জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
০১৮১৯১৭৫৭২২

আশরাফিয়া লাইব্রেরি
আল-জামেয়া রোড, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
০১৮১৫৬৩৭২১৫

কক্সবাজার

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফীক
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া টেকনাফ
টেকনাফ, কক্সবাজার।
০১৮১৭০০৯৩৮৩

কুমিল্লা

মাওলানা হাফেজ মুনীর
রানীর বাজার মাদরাসা
রানীর বাজার, কুমিল্লা।
০১৭১৫০০২১১৮

ফেনী

মুফতী মুহাম্মদ আসেম কাসেমী
জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া
ফেনী।
০১৮১১৯২৫৩১৯

নোয়াখালী

মাওলানা নুর হুসাইন
জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদী
মাইজদী সদর, নোয়াখালী।
০১৮১১০১৬০৪২

ব্রাহ্মনবাড়িয়া

মাওলানা জহিরুল ইসলাম
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল কোরআন সরাইল।
০১৭১৫১৪৮৭৩২

বগুড়া

মাওলানা আহসান হাবীব
জামিল মাদরাসা, বগুড়া।
০১৮২৭১৭১৭১৯

রংপুর

মাওলানা জুবাইর
জুম্মাপাড়া মাদরাসা
রংপুর। ০১৯৩৭৮৮৬১০৪

যশোর

মুফতী আব্দুর রহমান
জামিয়া এজাজিয়া রেলওয়ে স্টেশন মাদরাসা
চাঁচরা, থানা : কোতোয়ালি, যশোর।
০১৭৩১২৯১২৩২

ভোলা

মাওলানা বশীরুদ্দীন
মাদরাসা কোরআনিয়া দারুল আইতাম (সাবেক নাসিরমাঝি)
রতনপুর রোড, ভোলা।
০১৭১১৭০৮৮৯১

ফরিদপুর

মাওলানা মুহাম্মদ তালহা
কাসেমুল উলূম ঈদগাহ মাদরাসা
ভাঙ্গা, ফরিদপুর।
০১৮২০৫১৪৩৫১